হেমন্ত কুমার বসু

ভাষণ ও রচনা সংগ্রহ

ভূমিকা

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ',—জন্মশতবর্ষে হেমন্ত কুমার বসুকে স্মরণ করতে গিয়ে একথা বারবার মনে হয়, মানুষ হেমন্ত কুমার — খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের একান্ত আপনজন হেমন্ত কুমার — তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব, নিরহঙ্কার সারল্য, সকল প্রকার বিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন সাদাসিধে নির্লোভ জীবনযাত্রার আদর্শ, সততা-নিষ্ঠা-ত্যাগ-দেশপ্রেম ও জীবনব্যাপী সংগ্রামের বিরল ঐতিহ্য নিয়ে তিনি যখন আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর নানা কীর্তির দীর্ঘ তালিকা অতিক্রম করে সর্বাগ্রে মানুষ হিসাবে তাঁর প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। এই মনুষ্যত্বের অমরত্বের অধিকারে গত একশো বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে তিনি ইতিহাসে আপন স্থান করে নিয়েছেন।

তবু সেই ইতিহাসের স্বার্থেই তাঁর নানা কীর্তির কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। শুধু স্মরণ নয়, আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিত্য অবগতির জন্য তা গ্রন্থবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারি না। এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চারটি বই সংকলন ও প্রকাশনের কর্মসূচি নিয়েছি। বইগুলি হল—তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জীবনী, তাঁর জীবনের নানা কর্মের সাক্ষ্য হিসেবে অপর একটি সচিত্র জীবনী (অ্যালবাম), তাঁর সান্নিধ্যে আসা নানা গুণীজনের লেখা স্মৃতিকথা নিয়ে একটি 'স্মরণিকা', এবং চতুর্থটি হল তাঁর ভাষণ ও রচনার একটি সুনির্বাচিত সংকলন। জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিশ্রুত অন্যান্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে এই চতুর্থ প্রকাশনটিও আজ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করছি।

তবে তাঁর এই রচনা-অভিভাষণ ও বক্তৃতা সংগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে যে কথাটি বলে রাখা প্রয়োজন তা হল, তিনি জীবনব্যাপী যে অজস্র কর্মধারায় নিজেকে উন্মোচিত করেছেন সে তুলনায় লিখেছেন অনেক কম। 'রচনা' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, খাতাকলম নিয়ে মন দিয়ে বসে বড় বড় লেখা লিখে ফেলা তা করবার অবসর বা মানসিক তাগিদ হয়তো তিনি কমই পেয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ-উপরোধে যাও বা লিখেছেন তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায় পড়ে আছে, কোনদিন তিনি তা সযত্ন প্রয়াসে সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করেননি। ফলে দুষ্প্রাপ্য তার কারণে তার সামগ্রিক সংকলন আমাদের কাছে দুরূহ মনে হয়েছে। অবশ্য পাওয়া গেছে নেতাজী সম্বন্ধে লিখিত তাঁর বেশ কয়েকটি শ্রদ্ধার্ঘ ও মূল্যায়ন। এগুলির মূল্য অপরিসীম। তবে তাঁর অভিভাষণ বা বক্তৃতার সংখ্যা তো কম নয়। কাজের সঙ্গে কথা, বিভিন্ন বৈঠক বা জনসভায় নানা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, নানা সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে বহু ছোটখাটো বক্তৃতা এই নিয়েই

তো ছিল তাঁর কর্মময় জীবন। অসংখ্য কর্মীসভা থেকে শুরু করে বহু রাজনৈতিক সমাবেশ ও সম্মেলনে তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে উত্তেজনায় কম্পমান বিস্ফোরক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধীর স্থির জননায়ক অকম্পিত চিত্তে মানুষকে আন্দোলনের পথে ডাক দিয়েছেন। এই সব বিচিত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দেওয়া তাঁর অসংখ্য বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে হেমন্ত কুমার বসুর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তাধারার কথা প্রকাশ পেয়েছে তেমনই এক জনদরদী মানুষ এবং প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর কালের বিপ্লবী নেতার সংগ্রামী ভূমিকার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও এই মূল্যবান বক্তৃতাগুলিকে তেমন সামগ্রিকভাবে ধরে রাখা যায় নি। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু কিছু তা লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলির কিছু কিছু প্রসঙ্গান্তরে আমরা উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। তবু আক্ষেপ রইল, সেগুলির পুরো টেপ-রেকর্ড যেমন পাওয়া গেল না এবং যা-ও বা খণ্ডিতাকারে নানা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, মূলত সময়াভাবে, তা সব সংগ্রহ করা গেল না। তবে আশ্বাসের কথা, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বা সম্মেলনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণের লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। সেগুলিকে ভাষান্তরিত করে এখানে আমরা গ্রথিত করতে পেরেছি। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলির মধ্যে থেকে ভারতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক প্রথম সারির নেতার বহু জটিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। নেতাজীর দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সহযোগী হেমন্ত কুমার বসুর প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের আরও কিছু লিখিত ভাষণের প্রতিলিপি পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে এখনও আমরা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের পুরনো ফাইল বা কোথাও কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ও লেখ্যাগারে সংরক্ষিত দলিলের মধ্য থেকে, বা কোথাও কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে হয়তো বা তার কিছু কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে। জন্মশতবর্ষের সূচনায় সংকলিত এই সংগ্রহ গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও, পরবর্তী বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সন্ধান করা গেলে বারান্তরে তা প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

তবে সুখের কথা, হেমন্ত কুমার বসুর আরও একটি বড় পরিচয়ের লিখিত সাক্ষ্য সরকারি রেকর্ডে বিস্তৃতভাবে ধরা আছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে জনমানসে হেমন্ত কুমার বসুর যে পরিচয় বিধৃত আছে আমরা তারই কথা বলছি। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের আইন সভা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তিনি দীর্ঘকালের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রথম উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তারপর ক্রমান্বয়ে নির্বাচনে জিতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ও ফরওয়ার্ড ব্লকের পরিষদীয় দলের নেতা ছিলেন।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে তিনি ছিলেন পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী। শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশ কালব্যাপী পরিষদীয় রাজনীতির সংস্পর্শে থাকাকালীন বিধানসভার অসংখ্য অধিবেশনে তিনি নানা প্রসঙ্গে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন, Assembly Proceedings-এর মোটা মোটা বাঁধানো বইগুলির মধ্যে তাঁর ওই সব বক্তৃতা হুবহু ছাপা আছে। হেমন্ত কুমার বসুর

জীবন ও মতাদর্শের পরিচয় উদ্ধার করার কাজে নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ হিসাবে এগুলির মূল্য অপরিসীম। আমাদের এই সংগ্রহ গ্রন্থের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর ওই সব পরিষদীয় বক্তৃতাবলী। এই বক্তৃতাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে এতকাল আমরা অনেকেই তেমন সচেতন ছিলাম না। চলমান সমাজ ও রাজনীতির বহু অগ্নিগর্ভ বিষয়, জটিল সমস্যা ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে—বিরোধী পক্ষ বা সরকার পক্ষীয় নেতা হিসাবে—তিনি যে সব চিন্তা-যুক্তি-তথ্য সম্বলিত বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলি না জানলে হেমন্ত কুমার বসুর একটা বড় পরিচয়ই অজানিত থেকে যেত। খাদ্য আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন বা ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন, বন্দিমুক্তি, ছিন্নমূল বাস্তুহারা ও হকার্সদের পুনর্বাসন, বেরুবাড়ি হস্তান্তর বা চীনা আক্রমণের প্রতিবাদ, যক্ষ্মা রোগী বা বস্তিবাসীদের দুর্দশা, সুন্দরবনবাসী বা বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য ত্রাণব্যবস্থা, ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন বা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ভূমি সংস্কার বা শ্রমজীবী মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ও তাঁর সংগৃহীত অর্থ বা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ, আদালত আইন বা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়কে তাঁর বক্তৃতাবলী স্পর্শ করে গেছে। তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন ছিল আবেগ, তেমনই ছিল চিন্তা ও যুক্তির ছাপ। তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে দৃঢ়তা ও তথ্য-সমাবেশ, নিপীড়িত-জনগণের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, সৎ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবিচল আস্থা সব দলের সদস্যদেরই সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করত। জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে তাঁর এই অমূল্য বক্তৃতাবলী বক্ষ্যমান 'সংগ্রহ'-গ্রন্থভুক্ত করতে পেরে—এবং বিশেষ করে তা আজকের তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পেরে নিঃসন্দেহে আমরা একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের আনন্দ বোধ করছি। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেমন্ত কুমার বসুর এই পরিষদীয় বক্তৃতাবলীর পরিমাণ সুবিপুল। তার সবটা সংকলিত করতে হলে একটি স্বতন্ত্র তিন-চারশো পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করা দরকার। আমাদের বর্তমান প্রকাশন পরিকল্পনায় তার সংকুলান করতে না পারায় দুঃখ রয়ে গেল। আপাতত তার কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে গ্রন্থভুক্ত করা হল। বাকি অংশ বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

পরিশেষে উল্লেখ্য, এখানে তাঁর রচনা ও অভিভাষণ প্রথম অংশেও দ্বিতীয়াংশে আইন-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী সংগৃহীত হয়েছে এবং সবগুলিই কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এর ফলে সংগ্রামের ধাপে ধাপে তাঁর মানসিক বিবর্তনের ছবিটি ফুটে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই বিষয়ের ওপর তাঁর একাধিক রচনা বা বক্তৃতা রয়েছে। এগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

আশা করি পাঠক সমাজে এই 'সংগ্রহ' যথোচিত সমাদর লাভ করবে।

ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

সূচি ☐ রচনা

সূচি □ ভাষণ

রচনা সংগ্রহ

সংগ্রামের আহ্বান

কমরেড,

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের আজকের এই বিশেষ অধিবেশনে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এই অধিবেশন হচ্ছে এমনই এক সময়ে যখন এক গভীর সঙ্কট পার্টির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখার আগে আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নাগপুরের সেইসব বিশিষ্ট কমরেডদের কথা যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই, যাঁদের অনুপস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। আমি কমরেড আর এস রুইকর এবং কমরেড দাহিকরের কথা বলছি। কমরেড রুইকর একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাথমিক পর্বে তাঁর সাংগঠনিক অবদান দীর্ঘদিন মনে থাকবে। কংগ্রেসের কাছে পার্টিকে বিকিয়ে দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে যখন গোটা পার্টি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন অদ্ভুত সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এ রাজ্যের বিশিষ্ট নেতা কমরেড দাহিকরের মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং মর্মান্তিক। বিশেষ করে, যেভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে তা আমাদের সকলকেই হতবাক করে দিয়েছে। কমরেড রুইকর এবং কমরেড দাহিকরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মূল বক্তব্য রাখার আগে আমি আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আমি লজ্জা অনুভব করছি। কারণ ভারতের এই মহান শহর নাগপুরে আজ থেকে ১৫ বছর আগে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং এখান থেকেই তিনি সংগ্রাম শুরু করার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। নেতাজী এক সময় যে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন সেই আসনে বসা যেমন গর্বের এবং বিরাট সম্মানের ঠিক তেমনই বিরাট ঝুঁকির।

জেনারেল মোহন সিং, শ্রী যাজী ও অন্যান্যদের চক্রান্ত

বুর্জোয়াদের শ্রেণী সংগঠন কংগ্রেসের কাছে আমাদের পার্টিকে বিকিয়ে দেবার জন্য জেনারেল মোহন সিং শ্রী শীলভদ্র যাজীর মতো কিছু লোক যে খেলায় মত্ত হয়েছেন তা আজ প্রত্যেকের কাছেই পরিষ্কার। হতাশার কারণে এবং কিছু প্রাপ্তির লোভে পড়ে এই দুই ভদ্রলোক পার্টির সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সদস্যকেই কিছু না জানিয়ে অত্যন্ত গোপনে কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আমাদের পার্টিকে কংগ্রেসে মিশিয়ে দেবার জন্য। গত বছরের অক্টোবর মাসে যখন এই সম্ভাবনার ওপর সংবাদপত্রে খবর বেরোতে থাকে তখনই আমরা ঘটনাটা জানতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জেনারেল মোহন সিং এবং শ্রী যাজীকে বলি এ খবরের প্রতিবাদ জানাতে এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা এই খবরের বিরোধিতা করেন নি। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংও ডাকেননি। অবশেষে কোনও বিকল্প না পেয়ে ওয়ার্কিং কমিটির ২৬ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সদস্য জরুরি বৈঠক তলব করলেন, পাটনায় ,১৯৫৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। সেই বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে পার্টির সংযুক্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না কারণ 'কংগ্রেস হল ভারতীয় পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দল'। এই বৈঠক থেকে জেনারেল মোহন সিং এবং শ্রী যাজীকে বলা হল, পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গ করা এবং পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরানোর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ ডিসেম্বর, ১৯৫৪-র মধ্যে তাঁদের এই উদ্যোগ এবং কাজের ব্যাখ্যা দিতে হবে পার্টির কাছে। বৈঠক মুলতবি রাখা হল ২৭ ডিসেম্বর, কলকাতার পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের এই অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া মাত্রই জেনারেল মোহন সিং এবং শ্রী যাজী পার্টির সংবিধানকে লঙঘন করেই একটি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে দিলেন। এই কমিটি তাঁরা গড়লেন এমন কিছু লোককে নিয়ে যাঁদের অধিকাংশই বহু আগে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে অথবা পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু লোক আবার কয়েকদিন পরেই ঘোষিত কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবি বৈঠক বসে হাওড়ায়, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫৪ তারিখে। 'পাটনা বৈঠকের নির্দেশ অমান্য করা, পার্টির ঐক্য নষ্ট করা, গোষ্ঠীবাদকে উস্কানি দেওয়া, পার্টির গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবদমিত করা এবং পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনষ্ট করার প্রয়াসের' জন্য জেনারেল মোহন সিং এবং শ্রী যাজীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত ওই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওই বৈঠকে আমি দলের কার্যকরী চেয়ারম্যান এবং কমরেড হালদুলকর কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বৈঠকেই নাগপুরে বিশেষ অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই হল চক্রান্তের নেপথ্য কাহিনী। দৃঢ়তা এবং

পরিশ্রমের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এবং পার্টির বিপ্লবী কর্মীরা এই চক্রান্তের মোকাবিলা করেছেন। পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সামান্য কিছু লোক এই মতলববাজ ও বেপথু মানুষগুলিকে অনুসরণ করেছেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সব রাজ্যেরই সদস্যদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্ভবত পাঞ্জাব বাদে, তাঁদের নিন্দা করেছে এবং দ্বিগুণ শক্তিতে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা বহিষ্কৃত

আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কিছুদিন আগে ওয়ার্কিং কমিটি একই ভাবে শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি এবং কয়েকজনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্বার্থে তাঁরা আমাদের পার্টিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন ওদের দালালে আমাদের পরিণত করতে। আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে দুর্ভাগ্যবশত কখনও যদি কংগ্রেস বা সি পি আই এর সঙ্গে পার্টির সংযুক্তির কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে একই ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করা হবে।

প্রতিনিধিরা, বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করুন

কমরেড, আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন পার্টি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির নীতি এবং কর্মসূচি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরীতে আমরা শেষ মিলিত হয়েছিলাম। তারপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা আমার কাছ থেকে আপনারা আশা করতেই পারেন। আমার ভয় হচ্ছে, আমি সে কাজ আপনাদের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে করতে পারব কিনা। যাই হোক, গত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনার ওপর আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রাষ্ট্রসংঘের পর্যায়ে বিভিন্ন রকম প্রয়াস সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান কিন্তু পৃথিবীকে শান্তি ও গণতন্ত্রের নিরাপদ স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনি। বিশ্ব শক্তিগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শিবির, অন্যটি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং অন্য গণপ্রজাতন্ত্রীদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী শিবির। ভারত সহ সব রাষ্ট্রই এই শিবির বা ওই শিবিরে যোগ দিয়েছে। এই দুই শিবিরের মধ্যে

দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে এবং তাদের ঠান্ডা যুদ্ধ সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। গত কয়েক বছরে সমাজতন্ত্র এবং পুজিঁবাদের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে, একে অপরকে নির্মূল করতে চাইছে। তাছাড়া পুঁজিবাদী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তারা প্রকাশ্যেই মতপার্থক্য ঘোষণা করছে। আরও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টি করছে। তবে তাদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ।

দুর্বল হচ্ছে পুঁজিবাদ, শক্তিশালী হচ্ছে সমাজতন্ত্র

দিন যত যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী - পুঁজিবাদী শক্তি ততই নানা আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে। উপনিবেশগুলি একের পর এক তাদের হাতছাড়া হচ্ছে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নয়, ফরাসি, ওলন্দাজ এবং পর্তুগিজ সাম্রাজ্যও, এমন কি মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যও আজ মুছে যাওয়ার পথে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা সর্বত্রই মানুষ আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। একদিকে এইসব উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায় সাম্রাজ্যবাদী- পুঁজিবাদী শক্তিগুলি আর একটা যুদ্ধের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এই শক্তিগুলি নিত্যনতুন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে আর সেই সঙ্কটই আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স সর্বত্রই শ্রমিকরা আজ তাঁদের দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদী - পুঁজিবাদী শক্তিগুলি কখনই এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

প্রথমে কোরিয়ায়, তারপর ইন্দোচীনে মার্কিন অনুপ্রবেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এইসব যুদ্ধবাজ কীভাবে আমাদের আর একটা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চায়। কোরিয়ার জনগণ এবং তাঁদের সহযোগীদের, চীনা স্বেচ্ছাসেবকদের এবং হো চি মিনের বাহিনীকে ধন্যবাদ। কারণ তাঁদের জন্যই এই আক্রমণকারীদের সমস্ত মতলব এবং পরিকল্পনা চুরমার হয়ে গেছে।

এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন সর্বত্র জোট গড়ে তুলছে। সিয়াটো, সানজুস, ন্যাটো, ই ডি সি, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, তুর্কি-ইরাক চুক্তি, জার্মানির পুনরায় অস্ত্রসজ্জা—এসবই হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্রের চিহ্ন। চীনের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চিয়াং কাইশেক-এর দস্যুদলকে মদত দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ অভিযানের চক্রান্ত করছে।

রোম থেকে টোকিও পর্যন্ত বৃত্তাকারে অবস্থিত মার্কিন যুদ্ধঘাটিগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঘিরে ফেলা যায়। একের পর এক পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চলছে। এই পৃষ্ঠপটেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঁজিবাদী শোষণবিদ্ধ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন উপনিবেশ এবং অনগ্রসর রাষ্ট্রে মানুষ আজ বিদ্রোহ করছে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে।

যুদ্ধ নয় , শান্তি চাই

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, আর একটা যুদ্ধ বাধতে পারে এরকম যে কোনও উদ্যোগ বা প্রয়াসের আমরা বিরুদ্ধে। কেন? না, যুদ্ধের থেকে শান্তি ভাল, শুধুমাত্র এই কারণেই নয়। আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে এবং নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বাঁচতেই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা আজ যুদ্ধ চাইছে। এই যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আকাশে পায়রা উড়িয়ে, কিছু সই সংগ্রহ করে, কিছু প্রতিক্রিয়াশীল অথবা জনগণের শত্রুকে শান্তির দূত হিসাবে উপাস্যে পরিণত করেই কি আমরা তাদের প্রতিহত করতে পারব? আমার মনে হয় তা সম্ভব নয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচুর সই সংগ্রহ করা সত্বেও গত কয়েক বছরে যুদ্ধের প্রস্তুতি বেড়েছে বই কমেনি। শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিশালী সংগ্রাম এবং বিপ্লবী গণ-অভিযানই এই অবস্থাকে রুদ্ধ করতে পারে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করে, আরও নানা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, যুদ্ধের সমস্ত উৎস পুঁজিবাদকে আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত এবং নির্মূল করেই আমরা শান্তির দরজায় পৌঁছতে পারব, যুদ্ধের বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারব নিজেদের। শান্তি অর্জন করা যেতে পারে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে. শুধুমাত্র শান্ত করে নয়। বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির কাছে আমরা এই মঞ্চ থেকে আহ্বান জানাতে চাই, লেনিনের এই বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার আলোকে শান্তির জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলুন, পরিত্যাগ করুন সমস্ত রকম শান্তিবাদী মোহগ্রস্ততা।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হতে পারে না

যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি কেউ অনুধাবন করেন তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন কেন আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের বিরোধী। হ্যাঁ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র অবশ্যই পাশাপাশি রয়েছে। এটা আজকের একটা ঘটনা। কিন্তু কে বলেছে যে এই অবস্থান শান্তিপূর্ণ, বা শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে

পারে? আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কোনও ব্যাপারই হোক, বা কোনও ধর্মীয় বিষয়, যে-কোনও একটা ঘটনা তুলে ধরুন, দেখবেন এরা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। একটির বেঁচে থাকার অর্থ অন্যটির মৃত্যু, একটির যখন শেষ অন্যটির তখন শুরু। আমরা স্বীকার করি যে আগামী কোনও বিজয়ের প্রস্তুতিতে বা আচমকা কোনও আক্রমণকে প্রতিহত করতে এক বা একাধিক পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কোনও দেশকে অনাক্রমণ চুক্তিতে যেতে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ ঘটনাকে বিচার করতে হবে শুধুমাত্র সামরিক অথবা কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এর ওপর কোনও তাত্ত্বিক আস্তরণ ছড়ানো কখনই সঠিক কাজ হবে না। তত্ত্ব এবং প্রত্যয়ের সুউচ্চ স্তর থেকে একজন সমাজতন্ত্রী কী করে বলে যে পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের বন্ধু, পরবর্তী আবাহমাকাল ধরে এরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই থাকতে পারবে, অথবা যদি পুঁজিবাদ বেঁচে থাকে সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে, অর্থাৎ আরও এবং আরও শোষণ চালিয়ে, তাহলে সমাজতন্ত্রের কিছুই করার নেই? যেসব দেশে মানুষ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেখানে এ ধরনের কথাবার্তা অনেক বেশি বিপজ্জনক। গোটা ব্যাপারটাই ঝুঁকে পড়ছে এই তত্ত্বের বিন্যাসে যে কোনও শিল্পে পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক স্বার্থ শান্তিতেই পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে এবং তা করা যেতে পারে মালিকের মুনফাবাজিতে কোনওরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির তত্ত্বের জন্য যদি কিছু সমাজতন্ত্রী দেশ জওহরলা নেহরুকে শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত বন্ধু বলে বর্ণনা করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করব।

বান্দুং সম্মেলন

বান্দুং সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন আগে সেখানে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বসেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদকে বরদাস্ত না করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার লক্ষ্যে কোনও বলিষ্ঠ ঘোষণা যদি তাঁরা করতেন তাহলে আমরা তাঁদের নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা সেরকম কোনও ইতিবাচক পথ ধরতে পারেননি। হতে পারে, সম্মেলন দুভাগ হয়ে গিয়েছিল — কেউ নিন্দা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, কেউ বা ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে আক্রমণ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কিন্তু এটাই হল ঘটনা যে কীভাবে উপনিবেশবাদকে নির্মূল করতে হবে অথবা পুঁজিবাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে হবে শান্তিকে, সে বিষয়ে কোনও পথই দেখাতে পারেনি এই সম্মেলন।

জাতীয় পরিস্থিতি

এবার আমি জাতীয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করব। ব্রিটিশের সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতার কারণে কংগ্রেস নেতাদের এখন তার অনিবার্য ফলাফলগুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে লুণ্ঠন করেছে, ব্রিটিশ-মার্কিন এবং ভারতীয় পুঁজিপতিরা চালিয়েছে তীব্র শোষণ। দারিদ্র্য, অভাব, বেকারি, শিক্ষা-সমস্যা, উদ্বাস্তু-সমস্য দেখা দিয়েছে এবং গোটা দেশ নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ক্ষমতা-মত্ত গান্ধীবাদী সমঝোতাপন্থীদের হিংস্র থাবায়। ব্রিটিশ-মার্কিন সহযোগিতায় কংগ্রেস নেতারা আজ গভীর অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মেটাতে চাইছেন বহু প্রচারিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়ে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

কমরেড, আপনারা সকলেই জানেন, পরিণতি কী ঘটতে চলেছে। আমাদের জাতীয় সম্পদ পুঁজিপতিদের ভোগে লাগানো হচ্ছে। ডঃ মেঘনাদ সাহার মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং অন্যান্যরা এই পরিকল্পনা যে কতটা ফাঁপা তা খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থার দ্রুত অবনতির কথা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিছু কিছু শিল্পের কর্তাব্যক্তিরা অবশ্য বলছেন এবং প্রচারপত্র মারফৎ বলা হচ্ছে যে তাঁরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছেন, খাদ্যশস্য উৎপাদনও বেড়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট যদি আপনারা পড়েন তাহলে দেখবেন এ হল শুধু কথার ফুলঝুরি। অধিক উৎপাদনের মানে কি দাম কমে যাওয়া এবং পূর্ণবয়স্কদের বেশি বেশি করে খাদ্য দেওয়া? কিছুই না। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ১৩৭১ আউন্স সিরিয়াল দেওয়া। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলেও যা পাওয়া যেত তার থেকে ২ আউন্স কম। উপরন্তু এর দাম হবে এমন যা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালের জুলাইয়ে সিরিয়ালের মূল্যসূচক ছিল ৪০৩, চালের ৪৮১ এবং গমের ৪৩৪। বহু ঢক্কানিনাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, গোটা জাতিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, ধ্বংস প্রায় অনিবার্য। বিদেশি এবং দেশী পুঁজিপতিরা পাহাড় প্রমাণ মুনাফা লুটেছে, সারা দেশ এখন জর্জরিত শুধু দারিদ্র্যে।

বেকারি

বেকারের সংখ্যা দেশে ক্রমেই বাড়ছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবের মিলন সুদূর পরাহত। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে সীমাহীন ভাবে। ১৯৫০ সালে নথিভুক্ত বেকার ছিল ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৭১। ১৯৫৪ সালে এটা ১০০ শতাংশ হারে বেড়েছে।

পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ

পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ, এর ভিত্তিই ত্রুটিপূর্ণ। জনসাধারণের ওপর নির্ভর করা, আন্তরিক ভাবে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করার পরিবর্তে কংগ্রেস সরকার অনেক বেশি জোর দিয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিদেশি সাহায্যের ওপর। এরা জাতীয় উন্নয়নে কোনও রকম সাহায্য করেনি, একমাত্র নিজেদের স্বার্থ পূরণ করা ছাড়া। দ্বিতীয়ত, আমাদের মতো অনগ্রসর দেশে গুরুত্ব দেওয়া উচিত শিল্পের ওপর। শিল্পের যদি উন্নতি না ঘটে তাহলে কৃষিরও উন্নতি ঘটতে পারে না। আগে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কার্যত গরুর আগে গাড়িকে জুড়েছে। আমাদের সমস্ত টাকা বিদেশ থেকে ট্র্যাক্টর এবং যন্ত্রাংশ কিনতেই চলে যাচ্ছে, তাহলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর রইল কী? তৃতীয়ত, সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মী স্তরে দুর্নীতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। পরিকল্পনা সফল না হওয়ার সেটাও একটা কারণ।

শ্রম

শ্রমিকদের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। ছাঁটাই, লক-আউট ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছেন। এর ওপর মজুরি ছাঁটাই এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণের হুমকিও রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বোনাসের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। সম্প্রতি আরও একটি সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হল, শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক কোলিয়ারি দুর্ঘটনা সে কথাই বলে। পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারকে রক্ষা করতে শ্রমিকরা নিরন্তর লড়াই চালাচ্ছেন। বিভিন্ন অফিসে বিশেষত ব্যাঙ্ক এবং বীমায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মীরা নিজেদের ভালভাবেই সংগঠিত করেছেন। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আমি দুটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, বর্তমান ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময় এসে গেছে। এই গয়ংগচ্ছ কৌশল আসলে পরিচালন কর্তৃপক্ষকেই সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে যেভাবেই হোক ঐক্য রক্ষা করতে হবে। অন্ততপক্ষে এ আই টি ইউ সি এবং ইউ টি ইউ সি-র সংযুক্তির ব্যাপারে আর দেরি করা উচিত নয়। এই সংবাদে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি যে কমিউনিস্ট এই দুই সংগঠনের সংযুক্তির শুধু বিরোধিতাই করছে না, এ আই টি ইউ সি-র বৃহৎ অংশ হিসাবে তারা এমন সঙ্কীর্ণতাবাদী পথ নিয়েছে যে আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড হালদুলকর সহ, যিনি এ আই টি ইউ সি-র সহ সভাপতিও বটে , আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ পার্টি কমরেড সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবছেন।

কৃষক

কৃষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি আজও সমাধানের কোনও আলো দেখে নি। বহু প্রচারিত জমিদারির অবসান সম্পূর্ণ ভাঁওতা বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুছে যাওয়া জমিদারদের বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে এক নতুন গোষ্ঠীর শিল্পপতি তৈরি করা হয়েছে মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বন্টন করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমি এবং কৃষক সমস্যা মিটবে না। গ্রামীন ঋণভারও বিরাট চেহারা নিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সরকার এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং কোনও কিছু করার অযোগ্য।

শিক্ষা

সেনা ও পুলিশ বাহিনীর জন্য আমাদের সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের জন্য কোনও দাবি তোলা হয় তখনই তার অর্থভান্ডার ফাঁকা হয়ে যায়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে দেশের উন্নয়নের জন্য যে কোনও পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন। শিক্ষকদের অবস্থা যত কম বলা যায় ততই ভাল। আমি আশা করব, শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানকে সুন্দর এবং উন্নত করার জন্য সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ছাত্রদের অবস্থার দিকেও নজর দেওয়া দরকার।

উদ্বাস্তু

মাতৃভূমি ভাগ হওয়ার আট বছর বাদেও আমরা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি। এঘটনা অত্যন্ত লজ্জার। আমাদের সরকার আমাদের সামনে মসৃণ পথের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু গত আট বছরেও তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারে নি। জমিদারদের তোষণ, পুনর্বাসনের কাজে অযোগ্যতা, এইসব হতভাগ্য ভাই ও বোনেদের প্রতি সহানুভূতিহীনতা, সব কিছু মিলে ব্যর্থতা দাঁড়িয়েছে পাহাড় প্রমাণ। আমি দাবি জানাচ্ছি, এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে অবিলম্বে সর্বদলীয় উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হোক, যে পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুনর্বাসনের কাজ পরিচালনা করতে হবে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন

আমরা সকলেই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা আশা করব, এই সময়ে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে

জনসাধারণের দাবি কার্যকর হবে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে একই কংগ্রেস সংগঠনের বিভিন্ন রাজ্য কমিটিগুলি এই ইস্যুতে পরস্পর লড়াই করছে এবং এর ফলে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঈর্ষা, রেষারেষি বাড়িয়ে তুলছে।

অন্ধ্রের নির্বাচন এবং তারপর

অন্ধ্র প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে। একই ভাবে জয়ী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জেলা বোর্ড নির্বাচনে। এটা সত্যি যে জনসাধারণ সাময়িকভাবে খুবই হতাশ হয়েছে, বামপন্থীরাও নিজেদের দ্বিধাবিভক্ত করেছে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমেই সব পাওয়া যাবে, এই মোহ ক্রমেই কেটে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে এবং কংগ্রেস নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। নির্বাচনে এই পরাজয়ের জন্য আমাদের তাই ভয়ের কিছু নেই। চূড়ান্ত জয় হবে জনগণেরই।

আবাদি সমাজতন্ত্র — একটি ভাঁওতা

কংগ্রেস তার আবাদি অধিবেশন থেকে একটি নতুন স্লোগান দিয়েছে, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'। তখন থেকেই কংগ্রেসের সমস্ত নেতা এ বিষয়ে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, যদিও তা অন্তঃসারহীন। কিন্তু শুধু বক্তৃতায় কোনও কাজ হবে না। এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে' পৌঁছনোর জন্য কী কী করা হয়েছে? সমস্ত শিল্পকে জাতীয়করণ না করে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে না বাড়িয়ে, সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রকে বাড়তে দেওয়ার সুযোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতারা সমাজতন্ত্র আনার স্বপ্ন দেখছেন। এটা হল মিশ্র অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র নয়। কমরেড, শুধুমাত্র চকচক করলেই সোনা হয় না। এসব যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয় তার সব থেকে বড় প্রমাণ হল, এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে একমাত্র পুঁজিপতিরা। আমরা বিশ্বাস করি না যে কয়েকটা আইন পাশ করালেই 'সমাজতান্ত্রিক ধরন' প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এর জন্য সবার আগে দরকার সামাজিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কংগ্রেস সরকার বলছে, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনও রকম আঘাত না করেই একাজ করা যাবে। কার্যত এটা অসম্ভব ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের আবাদি ভাঁওতা, যাকে আমি 'কংগ্রেসি ধাঁচের সমাজতন্ত্র' বলে উল্লেখ করতে চাই, যে সমাজতন্ত্র আনবে না, জনসাধারণের কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, এটা এখন খুবই পরিষ্কার।

নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করা

স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের অধিকারকে সরকার যেভাবে খর্ব করে চলেছে সে ব্যাপারে কখনই আর উদাসীন থাকা যায় না। ১৪৪ ধারা প্রায়ই জারি হচ্ছে, নিবর্তনমূলক আটক আইনও সম্প্রসারণের অপেক্ষায়। আমার মনে হয়, নাগরিক অধিকার রক্ষার দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

অস্ত্র আইন প্রত্যাহার কর

প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকেরই মৌলিক এবং পবিত্র অধিকার হল অস্ত্র রাখা। 'ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত অস্ত্র আইন প্রত্যাহার কর এবং মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা প্রকৃত সৈনিক তাদের সশস্ত্র কর'— এই দাবি তোলার কি এটাই উপযুক্ত সময় নয়?

২৩ জানুয়ারি হোক জাতীয় ছুটির দিন

গভীর পরিতাপের বিষয় যে আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে এখনও সব রাজ্যে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে ২৩ জানুয়ারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

বিদেশ নীতি

গত কয়েক মাস ধরেই আমরা দেশে-বিদেশে নেহরুর বিদেশ নীতির প্রগতিশীল চরিত্র নিয়ে আলোচনা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা কি প্রকৃতই প্রগতিশীল অথবা শান্তি নীতি? সেটা দেখা দরকার আমরা আনন্দিত যে নেহরু সমস্ত রকম পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন, পাকিস্তান প্রসঙ্গে মার্কিন সামরিক নীতির সমালোচনা করেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এ সবের জন্য আমরা অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে? ভারত এখনও (ব্রিটিশ) কমনওয়েলথ তথা বিশ্ব জুড়ে ব্রিটিশ স্টারলিং-এর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। ভারত প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ আমেরিকান ডলারের সাহায্য পাচ্ছে। যার পরিণতিতে যে ভাবেই হোক না কেন দেশকে মার্কিন প্রভাবাধীনে থাকতে হচ্ছে। মালয় ও কেনিয়াতে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতের নীরবতা এবং গোর্খা সেনাদের স্থানান্তর সুযোগে অনুমতি দেওয়া তার প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশনীতিকেই সূচিত করে। চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে নেহরু ও তাঁর সরকারের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস ভারতীয় জনগণের আকাঙ্খাকেই সম্মানিত করেছে একথা ঠিক, কিন্তু ভারত সরকারের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল ওই অঞ্চলে ভারতীয় পুঁজি ছড়িয়ে দেওয়া। ভারত সরকারের বিদেশ নীতি তার অভ্যন্তরীণ নীতিরই পরিপূরক। জাতীয় সীমানার অভ্যন্তরে নেহরু সরকার যদি পুঁজিপতিদের সেবা করে চলে তাহলে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবে।

গোয়া

ভারত ভূমির অভ্যন্তরে কোনও রকম বিদেশি শাসনই বরদাস্ত করা যায় না। আমরা বুঝতেই পারছি না, গোয়া-দমন-দিউতে পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটাতে ভারত সরকার কেন এখনও দ্বিধাবোধ করছে, বিশেষ করে যখন সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর পর্তুগিজ সরকার প্রচন্ড অত্যাচার চালাচ্ছে। গোয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে সরকার যদি কঠোরতম কোনও ব্যবস্থা নেয় তাঁহলে আমরা তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাব। আর সরকার যদি সে রকম কোনও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলাব এবং গোয়াকে স্বাধীন করব।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিলোন

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সিলোন (শ্রীলঙ্কা) সরকার ওই দুই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার দিচ্ছে না। আমাদের দাবি, তা যদি তারা না দেয় তাহলে ভারত সরকারকে অবিলম্বে ওই দুই দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অর্থাৎ কূটনৈতিক দপ্তর বন্ধ করে দিতে হবে। রাষ্ট্রসংঘে তাদের সঙ্গে রফা চলবে না, কমনওয়েলথ থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে

তাহলে সমাধান কী? মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে কীভাবে? আমরা বিশ্বাস করি, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র সম্ভব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ভারতীয় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে। আর এর জন্য আমাদের এগোতে হবে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথ ধরে। সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হবে বিপ্লবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব, সংসদীয় ব্যবস্থাকেও গ্রহণ করব ঠিকই, কিন্তু সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমরা এই পথ নেব বিপ্লবের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে।

আমাদের দেশে কিছু রাজনৈতিক দল আছে, বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, যারা মনে করে ভারতে এই পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। কারণ ভারত এখনও ঔপনিবেশিক এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাদের মতে, জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে নয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আমরা মনে করি এই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল। ভারত ঔপনিপবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক পর্যায় ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে, জাতীয় পুঁজিপতিরা এই ক'বছরে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে এবং তারাই এখন দেশে শাসন পরিচালনা করছে। সেই কারণে ভারতে আজ আমাদের লড়াই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে।

জনগণের অন্তহীন সংগ্রাম

এই পরিস্থিতিতে, কমরেডগণ, জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে আপনাদের শক্তিশালী সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। মনে রাখতে হবে কংগ্রেসি শাসনে লড়াই না করে কিছুই পাওয়া যাবে না। খেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, খনিতে, বন্দরে এবং পরিবহনে, এমন কি অফিস এবং ব্যাঙ্কেও খেটে খাওয়া মানুষদের সংঘবদ্ধ করতে হবে আপনাদের। জনগণের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ওপর ভিত্তি করে আপনাদের এমন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে এমন চেহারা দিতে হবে যে জনসাধারণের এই শক্তিশালী আঘাতকে যাতে বুর্জোয়াদের সরকার কোনও ভাবেই সামলাতে না পারে। কলকাতায় ট্রাম-বাসে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে আন্দোলন এবং খাদ্য আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বাম ঐক্য

জনগণের সদিচ্ছা সত্বেও গত নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যান্য কারণ থাকলেও বাম বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হল বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্য। পূর্বের মতো, নির্বাচনের পরেও আমরা বাম ঐক্যের চেষ্টা চালিয়েছি। বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যৌথ বাম আন্দোলনের প্রতি দুই বৃহৎ দল সি পি আই এবং পি এস পি-র অশ্রদ্ধা এই ঐক্যের চূড়ান্তকরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাম ঐক্যে এরা যে শুধু যোগ দেয়নি তাই নয়, এই ঐক্যকে তারা বিপর্যস্ত করার চেষ্টাও করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক বাম ঐক্য চায়। একে সফল করার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক অক্লান্ত চেষ্টা চালাবে এবং তার জন্য যে কোনও রকম আত্মত্যাগেও আমরা প্রস্তুত। জনগণের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র প্রকৃত বাম ঐক্য। আর এই বাম ঐক্যেই আঘাত হানতে পারে কংগ্রেস সরকারের ওপর, ঘটাতে পারে এর পতন।

মার্কসবাদী দলগুলির ঐক্য

আমাদের দেশের রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করব। এই ঘটনাটি হল সব কটি প্রকৃত মার্কসবাদী পার্টিকে একটি পার্টিতে পরিণত করার উদ্যোগ। আপনারা জানেন, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কয়েকটি মার্কসবাদী দল সমবেত হয়েছিল এবং এই ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনার পর তারা একটি পার্টিতে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পার্টি গঠন এবং তার নামকরণ চূড়ান্ত করার আগে তারা সাময়িকভাবে মজদুর কিষাণ পার্টি হিসাবে পরিচয়

গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আপনাদের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতে এই পার্টি কাজ করবে বলেই নয়, আপনাদের ভাবতে হবে কারণ আপনাদের পার্টি সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক গত সাধারণ নির্বাচনের পরে যে উদ্যোগ নিয়েছিল এ ঘটনা তারই ফলশ্রুতি। পি অ্যান্ড ডব্লিউ পি, আর এস পি এবং অন্যান্য কিছু দলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর পরই পার্টির তদানীন্তন মোহন সিং যাজী-নেতৃত্ব সমস্ত আলাপ আলোচনার দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বলটিকে তখন গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের কাছে উষ্ণ আমন্ত্রণ এসেছে নতুন পার্টিতে যোগদান এবং তা গঠন করার জন্য। আমরা এখন কী করব? আমার মনে হয় এই উদ্যোগকে সঠিক চেহারা দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রয়াস চালানো উচিত এবং এজন্য আমাদের উচিত অবিলম্বে মজদুর কিষান্ পার্টি এবং তার শরিক দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের প্রিয় ফরওয়ার্ড ব্লক দলের অবলুপ্তি নিয়ে আমাদের কিছু কমরেড কী ভাবছেন। আমি তাঁদের এই ভাবনার প্রশংসা করি। কিন্তু একই সঙ্গে আমি তাঁদের কাছে আবেগবর্জিত ভাবনার জন্য আবেদন জানাব। যদি তাঁরা তা করেন তাহলে তাঁরা দেখবেন তাঁদের ভয় এবং সন্দেহের কোনও ভিত্তি নেই।

যদি এইসব দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় তাহলে আমরা কী করব? আমাদের দেখতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মর্যাদাকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে আমরা এই ঐক্যে যোগ দিতে পারব কিনা। যদি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহলে এক বছর আগে দেওঘরে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন থেকে আপনাদের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহারে বাধা কোথায়? আপনারা যদি মনে করেন যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মজদুর কিষান পার্টির ঘোষিত নীতির সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পূর্ণ একমত, তাহলে আমি অনুরোধ করব আলোচনা চালিয়ে যান।

সমস্ত নেতার মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই নেতাজীর প্রতি আমরা আমাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করছি। আমাদের সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেই কি আমরা তাঁর কর্মপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হব না? তিনি সম-মতাবলম্বীদের সব সময় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছেন। বিশের দশকের শেষে নেহরুর সঙ্গে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের যাঁরা বিরোধী তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইনডিপেন্ডেন্স লিগ গঠন করেছিলেন। যাঁরা অবিলম্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে ১৯৩৯ সালে তিনি গঠন করেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার জন্য যাঁরা প্রস্তুত ছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি ১৯৪১ সালে গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই যে আজ যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তাহলে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত শক্তিগুলিকে একত্র করে

একটি সংগঠনে পরিণত করা উদ্যোগ নিতেন। সুতরাং আপনারা যদি নেতাজী এবং তাঁর কাজের পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে এই প্রয়াসকে সমবেত স্বরে স্বাগত জানাবেন। কমরেডগণ, সম-মতাবলম্বীদের ঐক্যের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হয়েছে। শুধুমাত্র এই পথ অনুসরণ করেই আমরা নেতাজীর এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযানকে সফল করতে পারব। সবকিছু থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে নয়, বরং এই ধরনের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত থেকেই আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তার আদর্শকে সফল করতে পারব।

ধন্যবাদ, কমরেডগণ

বক্তব্য শেষ করার আগে, অনেক কষ্ট সহ্য করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরা আজ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাব নাগপুরের কমরেডদের, কমরেড সিরিয়া, কমরেড মহেন্দ্র এবং অন্যান্যকে। অতি অল্প সময়ের নির্দেশে তাঁরা এই বিশেষ অধিবেশনের চমৎকার ব্যবস্থাপনা করেছেন। এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতিত্ব করতে দেওয়ার জন্যও আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংগ্রামের আহ্বান

কমরেডগণ, আমি আবার আপনাদের সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছি। সংগঠনকে শক্তিশালী করুন, শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করুন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলুন — ভবিষ্যৎ আপানদেরই। জয় হিন্দ।
বিপ্লবী দীর্ঘজীবী হোক।
নেতাজী দীর্ঘজীবী হোন।
ফরওয়ার্ড ব্লক ও তার আদর্শ দীর্ঘজীবী হোক।
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিগুলির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশেষ
কনভেনশনে সভাপতির ভাষণ।
নাগপুর। ১১ থেকে ১৫ মে। ১৯৫৫

আগামী দিন আপনাদেরই

কমরেড,.

ঠিক তিন বছর আগে, ১৯৫৫ সালের মে মাসে আমরা নাগপুরে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়েছিলাম। কংগ্রেসের কাছে পার্টিকে বিকিয়ে দেবার এক কুৎসিত খেলা তখন চলছিল। আপনাদের সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ওই বিশেষ অধিবেশনে আমরা পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলাম, ভারতের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই যে ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্তিত্ব থাকা দরকার তা প্রমাণ করার জন্যই পার্টি তার নিজস্ব পথে চলবে। আমি একথা ভেবে অত্যন্ত আনন্দিত যে ওই সময়ে একথা ঘোষণা করে আমরা নিজেদের সঠিক প্রমাণ করেছিলাম। ফরওয়ার্ড ব্লক তার অস্তিত্বই শুধু রক্ষা করে নি। এই ক'বছরের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ করেছে। সংসদীয় এবং তার বাইরের কাজকর্মের ক্ষেত্রে পার্টি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

মূল বক্তব্য রাখার আগে আমাকে এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ফের সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে অনুরোধের জন্য আপনাদের সবাইকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাব। আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং আমি জানি যে এই উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত আমি নই। তবুও আমি এই পদ গ্রহণ করেছি কারণ আমি জানি, এই অনুরোধ হল আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসারই প্রকাশ। পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ব্যাপারে আপনারা আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের চমৎকার ব্যবস্থাপনার জন্য আমি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গুরুত্বপূর্ণ কমরেডরা অনুপস্থিত

প্রথমেই আমি উল্লেখ করতে চাই, আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমরেড কোনও না কোনও কারণে এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। আমাদের ডেপুটি চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য কমরেড ইউ এম থেবরকে অত্যন্ত বাজে কারণ দেখিয়ে মাদ্রাজের জেলে আটকে রাখ হয়েছে। আমি এই কাজের জন্য মাদ্রাজ সরকারের তীব্র নিন্দা করছি এবং কমরেড থেবরকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। আমাদের মাদ্রাজের প্রতিনিধিদের এমন ভাবে নানা মামলায় জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে এই সম্মেলনে তাঁরা যোগ দিতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টির ওপর চরম পুলিশি নির্যাতন চলছে। কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিসহ ৬৫৫ জন অনশনকারীকে ১মে ১৯৫৮ পর্যন্ত জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। যে কারণে এঁদের অনেকেই এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি।

এই ধরনের রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন, এটাই প্রথা। বিস্তারিতে না গিয়ে আমি আজকের প্রধান ইস্যুগুলি উল্লেখ করব।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন

যেহেতু দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম আমরা সভায় মিলিত হচ্ছি তাই এই ঘটনাকে দিয়ে শুরু করাই ঠিক কাজ হবে। গত নির্বাচন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে কংগ্রেস পিছু হটছে। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং আসামের মতো শক্ত ঘাটিতে কংগ্রেস তার মাটি হারাচ্ছে। যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই মানুষ কংগ্রেসকে তার অযোগ্যতা, দুর্নীতি এবং জনবিরোধী প্রশাসনের জন্য অপছন্দের কথা প্রকাশ করেছে। একটি রাজ্য কেরলে সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। সেখানে সরকার গঠন করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বামপন্থীদলগুলি যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক জোট হয় তাহলে আরও কিছু রাজ্যে অ-কংগ্রেসি সরকার গঠন করা সম্ভব। সন্তোষজনক না হলেও আমাদের পার্টি আগের তুলনায় গত নির্বাচনে ভাল ফল করেছে। নির্বাচনে কংগ্রেস কম ভোট পাচ্ছে এবং বামপন্থী দলগুলি বেশি ভোট পাচ্ছে, এই ঘটনা স্বভাবতই আমাদের সুখী করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে। আমরা, বামপন্থীরা, বিশ্বাস করি না যে পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত সমস্যা, সমস্ত কুফলের অবসান ঘটানো যাবে সংসদীয় পদ্ধতিতে। আমরা এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। এবং আমরা জানি, এই পদ্ধতি আমাদের সামান্য কিছুটা

এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আমাদের যে মূল লক্ষ্য সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না। পুঁজিবাদী শোষণের যে ভয়ঙ্কর চক্র তাকে যেমন ব্যালট বাক্স ধ্বংস করতে পারে না তেমনই জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারে না। এর জন্য দরকার সংসদের বাইরে গণ কর্মসূচি, যা গড়ে তোলে সুষ্ঠু বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রাম। সমকালীন ইতিহাস এই মৌলিক সত্যকে বারবার প্রমাণ করেছে। কিন্তু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে নির্বাচনী জয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষমতার অংশীদারী কখনও কখনও আমাদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আমাদের বিশ্বাস করিয়েছে যে নির্বাচন হল একটা মহান পবিত্র কাজ। এইভাবে এইসব নির্বাচন সুকৌশলে আমাদের বেশ কিছু বামপন্থী বন্ধুকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে এবং গণ অভিযানের ক্ষেত্রে হতাশা এবং স্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি প্রতিক্রিয়াশীলদের সুযোগ দিয়েছে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার। আমার বক্তব্য হল, বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব, ব্যাপক সংখ্যায় সংসদে আমাদের সদস্য এবং অন্যান্যদের পাঠাব এবং যদি সুযোগ আসে তাহলে আমরা সরকার গড়ব। সরকারে থাকাকালীন নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যদি আমলাতন্ত্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে এবং পুঁজিবাদী কাঠামোয় নিশ্চিত ভাবে সেটাই ঘটবে, তাহলে আমরা আদর্শকে রক্ষা করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আমরা সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসব এবং জনগণকে আহ্বান জানাব নির্বাচন ছাড়া অন্য পথ ধরে এগিয়ে যাবার জন্য। কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে আপসে যাব না, যদিও ক্ষমতায় থাকার জন্য অনেকেই তা করে থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব বাতাস ভারী হয়ে আছে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষায়। বৃহৎ শক্তিগুলির হাতে সমূহ ভয়ঙ্কর সব পরমাণু অস্ত্র আজ মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রতি যে করেই হোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। এই সূত্রে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা একতরফা ভাবে বন্ধ রাখার জন্য আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাই এবং তাকে অনুসরণ করার জন্য অন্য দেশগুলিকেও অনুরোধ জানাচ্ছি। পূর্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলনের দিকে আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি এবং আমরা আন্তরিকভাবেই আশা করি, বিশ্বে

শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন বিশেষ সহায়ক হবে। যুদ্ধকে বেআইনি করার জন্য যেখানে যেখানে লড়াই চলছে সেখানেই শান্তিকামীদের সঙ্গে আমরা হাত মেলাব।

গত কয়েক বছরে সারা বিশ্ব জুড়েই সমাজতন্ত্রী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এবং চীনে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে জে ভি স্তালিন এবং তাঁর সহযোগীদের বিভিন্ন রকম কুকাজের যে তথ্য ধরা পড়েছে তা থেকেই বোঝা যায় সোভিয়েত নেতারা তাঁদের ভুলগুলিকে সংশোধন করতে চান, যদিও এ -বিষয়ে এখন অনেক কিছুই করা বাকি। মার্কিন মদতপুষ্ট ব্রিটিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকা ও এশিয়ায় তাদের উপনিবেশগুলিতে চূড়ান্ত অত্যাচার চালালেও এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে কেনিয়া, আলজিরিয়া, নাইজিরিয়া, ইরান এবং আফ্রো-এশীয় অন্যান্য অংশ থেকে সেখানকার বীর জাতীয়তাবাদী বাহিনী তাদের বের করে দেবেই। মধ্য প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে যে আরব জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষ ঘটেছে সেই শক্তিকে এবং আব্দুল গামেল নাসেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতিদিন সমাজতন্ত্রী শিবির অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশ হারাচ্ছে। পুঁজিবাদীরা তাদের দেশগুলিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক মন্দা) — এইসব ঘটনা সত্বেও একথা কখনই বলা যায় না যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। প্রতিদিনের ঘটনাবলী এই ইঙ্গিতই দেয় যে এই দুটি পন্থা কখনই শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। বরং অন্যকে গ্রাস করাই হবে তাদের মূল চেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি এখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে ন্যাটো, সিয়াটো, বাগদাদ প্যাক্ট এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলি মারফৎ ঘিরে ফেলছে। অন্তর্ঘাতের জন্য প্রতিটি সুযোগকে তারা কাজে লাগাচ্ছে। সুয়েজ দখল থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবিপ্লব পর্যন্ত ঘটনাবলী একথাই প্রমাণ করে। আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পৃথিবী থেকে যেদিন আমরা পুঁজিবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে পারব সেদিনই নিরাপদ হবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং শান্তি।

কংগ্রেসি অপশাসন

আমাদের দেশের শাসনভার ব্রিটিশের হাত থেকে কংগ্রেসের হাতে এসেছে তা আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবেই সাধারণ মানুষের উপকারে আসে এমন কাজ খুব সমান্যই করা হয়েছে। কংগ্রেসি শাসনের এই এক

দশকে ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হয়েছে। এর কারণ হল প্রশাসন রয়েছে পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে। এরা জনসাধারণের ভালর জন্য কিছু করতে পারে না। স্বার্থপর, সুবিধাবাদী এবং কায়েমী স্বার্থের দালালরা যখন ক্ষমতায় থাকে তখন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং অযোগ্যতা জন্ম নেয়। কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনে ভেতরে ভেতরে যে কী চলছে তা পরিষ্কার করে দিয়েছে জীবনবীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে মুন্দ্রার কারবারের সাম্প্রাতিক কাহিনী।

'অন্য সুর।'

খুবই বিস্ময়কর ঘটনা যে এগারো বছর ধরে গদিতে থাকার পর নেহরু আজ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর এবং তাঁর সংগঠনে কিছু অন্য সুর বাজছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বাঁশি যিনি বাজান তিনিই সুর নিয়ন্ত্রণ করেন। নেহরু যদি সৎ এবং কর্মনিষ্ঠ হন তাহলে তিনি বর্তমান সরকারের বাঁশিওয়ালা অর্থাৎ পুঁজিপতিদের প্রকাশ্যেই ছুঁড়ে ফেলে দিন। যদি তিনি তা না পারেন এবং সেটাই স্বাভাবিক, তাহলে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসুন এবং সমাজতন্ত্রী শক্তিকে নেতৃত্ব দিন। সেক্ষেত্রে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। কিন্তু আমাদের ধারণা, যেহেতু তিনি পুঁজিবাদীদের ঘনিষ্ঠ তাই একাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আমাদের আজকের অর্থনীতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। আপনাদের একথা মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য হবে না যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই পরিকল্পনা প্রথম চালু করেছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল রূপায়নে উৎসাহিত হয়ে নেতাজী ১৯৩৮ সালে প্রথম ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন। কংগ্রেস সরকার যদি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি বা সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি অনুসরণ করত তাহলে আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হত না। আমাদের দেশে পরিকল্পনা একদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধিতে সমস্ত রকম সাহায্য করেছে, যা সমাজতন্ত্রভিত্তিক অর্থনীতি কখনই মেনে নিতে পারে না; অন্যদিকে এই পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের ওপর বাড়িয়েছে করের বোঝা। কংগ্রেস সরকার যদি মনে করে যে সরকারি ক্ষেত্রে কিছু শিল্প স্থাপন করলেই দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যাবে বা সমাজতান্ত্রকে অর্জন করা যাবে তাহলে তারা ভুল করবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারী ও মূলগত শিল্পের ওপর জোর দেওয়াকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পনার সাফল্যের ব্যাপারে মানুষের মনে

আশা এবং উৎসাহ সৃষ্টি করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনা-কালের শেষে যদি বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যদি বর্তমান হারে ছাঁটাই এবং লক-আউট চলতে থাকে এবং মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশের বেশি মানুষের জাতীয় আয় যদি না বাড়ে তাহলে দেশের সাধারণ মানুষ এই পরিকল্পনাকে একান্ত আপন করে নেবে না এবং সেক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য কোনও অতিরিক্ত ভার বা কষ্ট তারা বহন করবে এমনও আশা করা যায় না। সেই কারণেই আমাদের দাবি, এই পরিকল্পনা নতুন করে ঢেলে সাজানো হোক। বেকারি এবং সমাজ-কল্যাণের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে জোর দেওয়া হোক শিক্ষা ক্ষেত্রেও। বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ, বেসরকারি ক্ষেত্রের অবলুপ্তি এবং সামগ্রিক রাষ্ট্রীয়করণ হোক প্রকৃত গণপরিকল্পনার সূচনাবিন্দু।

শ্রমিক

শ্রমিকের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না। ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি বা ন্যূনতম ১০০ টাকা মাসিক বেতনের যে দাবি শ্রমিকরা জানিয়েছিল সরকার তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। বিস্ময় এখানেই যে এর পরেও সরকার বলছে তারা নাকি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি অনুসরণ করছে। দলে দলে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে ঘোষিত হচ্ছে লক-আউট। সরকার কিন্তু সব সময়েই মালিক পক্ষকে মদত দিচ্ছে, পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের দাবি, শিল্প পরিচালনায় অবিলম্বে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করতে হবে।

কৃষক

দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, কৃষকরা আজও তাদের জমির মালিকানা পায় নি। উপরন্তু এখনও ব্যাপকহারে তাদের উৎখাত করা হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা, খাদ্য সমস্যার সমাধান অসম্ভব যদি না আমরা চাষীদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দিয়ে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করতে না পারি। আমরা মনে করি, কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য সমস্ত ঋণ মকুব করে দিতে হবে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুন করে ঋণ দিতে হবে, সেই সঙ্গে দিতে হবে বীজ, সার এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিশেষত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সরকার যে চরম অবহেলা দেখাচ্ছে, আমার কাছে তার থেকে বড় লজ্জা আর কিছু নেই। গত দশ

বছরে কোটি কোটি টাকা জলের মতো খরচ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পুনর্বাসন ঘটেছে খুব সামান্য লোকেরই। এই ব্যর্থতার কারণ হল ভাবনার অভাব, অবহেলার নীতি, উদাসীনতা, প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ছাড়াই উদ্বাস্তুদের শাট্‌ল-ককের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন শিবিরে, ফুটপাতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবস্থানরত উদ্বাস্তুরা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসুন, নীতি নির্ধারণ করুন এবং জরুরিকালীন ভিত্তিতে তা কার্যকর করুন।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন

অত্যন্ত গর্বের সঙ্গেই আমি স্মরণ করি, দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ কীভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য লড়াই করেছে এবং জিতেছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে মহারাষ্ট্র এবং মহাগুজরাটের মানুষ প্রায় একমত হলেও সরকার তাদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠন করতে রাজি হয়নি। আমরা তাদের দাবিকে সমর্থন জানাই।

সরকারি ভাষা

সরকারি ভাষা সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা বলব। সম্প্রতি এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সারা দেশে দুর্ভাগ্যজনক এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক শুরু হয়েছে। আমাদের বিবেচিত অভিমত হল, ভারতের ৪২ শতাংশ মানুষের ভাষা যেহেতু হিন্দি এবং যেহেতু এই ভাষা অহিন্দিভাষীদের অনেকাংশের পক্ষেই বোধগম্য তাই রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগে এবং কেন্দ্রের কাজকর্মে হিন্দি হোক সরকারি ভাষা। রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তরের সরকারি কাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত কাজ হবে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষায়। কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারি কাজে ইংরাজি ততদিনই ব্যবহৃত হবে যতদিন পর্যন্ত না এই কাজের পক্ষে হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা যথেষ্ট ভাবে চালু হচ্ছে এবং জনগণ তা গ্রহণ করছে। আমার মনে হয়, এই পদ্ধতিতে চললে আর কোনও বিতর্ক থাকবে না। তবে আমরা দৃঢ় ভাবে মনে করি, ইংরাজি চিরকালের জন্য সরকারি ভাষা হতে পারে না, যদিও কেউ কেউ আমাদের তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যদি তা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনের মধ্যে তা বর্তমান ব্যবধানকে বিস্তৃততর করবে। কিন্তু সরকার এবং গোঁড়া হিন্দিপন্থীদেরও আমি এই বলে সতর্ক করতে চাই যে তাড়াহুড়ো করে কোনও পরিবর্তন ঘটানোর যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে অহিন্দিভাষীদের মধ্যে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, যার ফল হবে বিপজ্জনক।

গোয়া ও কাশ্মীর

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে গোয়ায় পর্তুগিজ শাসন আজও আমাদের সার্বভৌমত্বকে ব্যঙ্গ করছে এবং আমাদের দেশ থেকে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনের এই চিহ্নটুকুকে মুছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কাশ্মীর সংক্রান্ত নীতিও ভীতত্রস্ত অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এই সূত্রে আমরা ঘোষণা করছি, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশতে পরিণত হয়েছে এবং গণভোট বা অন্য এই ধরনের যে কোনও উদ্যোগকেই সবরকম ভাবে প্রতিহত করা হবে।

কমনওয়েলথ ছাড়ো

কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা আসলে আমাদের নির্ভরতা ও দুর্বলতারই পরিচয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সরকার যে শক্ত কোনও নীতি নিয়ে চলতে পারছে না তার কারণ হল ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সুয়েজ দখল, কমনওয়েলথের দুই সদস্য-রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিলোনে বসবাসকারী ভারতীয়দের অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠলেও সরকারের নিস্পৃহ ভঙ্গী, ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক মার্কিন অন্তর্ঘাতের বরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ব্যর্থতা — এই সব ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত। আমরা দাবি জানাচ্ছি, ভারত অবিলম্বে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসুক।

ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও সংগ্রাম

বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ প্রতিদিনই বাড়ছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে জনগণ লড়াই চালাচ্ছে। মানুষ দাবি জানাচ্ছে খাদ্যের, চাকরির, আশ্রয়ের এবং শিক্ষার। এবং এর জন্য তারা গ্রেপ্তার বরণ করতে, সরকারি নির্দেশ অমান্য করতে এমন কি বুলেটের মুখোমুখি হতেও প্রস্তুত। আমাদের কর্তব্য হল তাদের এই লড়াইকে তীব্র করা এবং তাকে এমন এক ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত করা যাতে তা বর্তমান শাহিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে সাবধান

মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাঘম কেরলে মুসলিম লিগ ক্রিস্টোফাররা পাঞ্জাবে অকালিরা ও জনসংঘ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং ভারতের পূর্বতন দেশীয় কিছু রাজ্যের প্রাক্তন শাসকরা যেভাবে আমাদের দেশের নিরাপত্তাকে নষ্ট করার কাজে নেমেছে তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের অনেকগুলি নীতির সঙ্গেই আমরা একমত নই। আমরা বিশ্বাস করি না পুঁজিপতিদের

সঙ্গে সহযোগিতার যে নীতি তারা নিয়েছে তা জনগণ বা সমাজতন্ত্রের পক্ষে কোনও উন্নতি ঘটাতে পারে। তারা ভুল পথে যাচ্ছে। কিন্তু কেরল সরকারের বিরুদ্ধে গোঁড়া ক্যাথলিক বাহিনী এবং মুসলিম লিগের মতো প্রতিক্রিয়াশীলরা যে অভিযানে নেমেছে তা আমরা কোনওভাবেই মেনে নিতে রাজি নই। এদের সঙ্গে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিও হাত মিলিয়েছে। এঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। কোনও রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য লড়াই করার অধিকার অন্য রাজনৈতিক দলের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক আচরণের একটা মান থাকা উচিত। আমি বিষয়টা তুলছি এই কারণেই যে ভবিষ্যতে অন্যান্য দলও অন্যান্য রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারে।

বাম ঐক্য

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমরা সমস্ত বামপন্থী দলকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমরা বাম ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এবং তার জন্য প্রয়াস চালাই। কিন্তু এই সূত্রে আমাদের ধারণা, বাম ঐক্যের ভিত্তি হওয়া উচিত উভয়পাক্ষিক। বাম ঐক্যের নামে একজন আর একজনের হাতে নিছক ব্যবহৃত হতে পারে না। এক্ষেত্রে দুই বৃহৎ দল কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। আমি একথা ফের উল্লেখ করার জন্য দুঃখিত যে এ আই টি ইউ সি-তে সি পি আই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতাবাদী ভূমিকা নিয়েছে এবং তার ফলে শ্রমিক আন্দোলন তথা বাম ঐক্যের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুদের সুবুদ্ধি হবে তাঁরা তাদের এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করবেন এবং ঐক্যের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হবেন, একথা আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি-র দুটি শাখা এবং এইচ এম এস-কে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাব কারণ আজকের ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের পক্ষে এটা খুবই জরুরি। অন্যান্য গণসংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার ব্যাপারে যেসব দল বিশ্বাসী তাদের সবাইকে আমরা ঘনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই কারণেই এই আহ্বান যে কিছু রাজনৈতিক দল দেশে এবং বিদেশে সাম্যবাদের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বলছে , সংসদীয় পদ্ধতিতে এবং শান্তিপূর্ণ পথে নাকি সমাজতন্ত্র অর্জন করা সম্ভব। বেশ কিছু নীতিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সকলের পক্ষেই ভয়ঙ্কর এক সতর্কবার্তা।

ক্ষেতে খামারে, কলে-কারখানায় এবং অন্যত্র ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। আমি তাই আপনাদের আহ্বান জানাব, সংগঠনকে শক্তিশালী করুন, সমস্ত দুর্বলতাকে দূর করুন, যে বিরাট কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তার জন্য নিজেদের প্রশিক্ষিত করুন।

কমরেড, কাজে নামুন। আগামী দিন আপনাদেরই। জয় হিন্দ।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

ফরওয়ার্ড ব্লক দীর্ঘজীবী হোক

নেতাজী দীর্ঘজীবী হোন।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

বাঘোরা, মুলতাই (বেতুল), মধ্যপ্রদেশ।

৮ থেকে ১১ মে, ১৯৫৮।

সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণীয় তেইশে জানুয়ারি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন দেশ মাতৃকার সাধনায় উৎসর্গীকৃত। ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেনে ভারতের জাতীয়তার প্রতি বিরুদ্ধ আচরণে সুভাষচন্দ্র যেমন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, গণদেবতার উপাসক সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন সেইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, আপসহীন সংগ্রামেরই কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও দেশমাতৃকার আহ্বানে তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের সেই বীরত্বময় সংগ্রামের কাহিনী সমগ্র ভারতের ও ভারতবাসীর পরম গৌরবের বিষয়। ১৯৩০ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সাল ভারতের জাতীয় জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণ। আসন্ন মহাযুদ্ধের আভাস নেতাজী বহু পূর্বেই পাইয়াছিলেন। ইহা সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তিনি আসন্ন মহাযুদ্ধের সুযোগে দেশকে বিপ্লবের পথে প্রস্তুত করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতায় গান্ধীজি শেষ পর্যন্ত "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন করিতে বাধ্য হন।

৪২ সালের গণ আন্দোলনে দেশের সংগ্রামী জনতার চেষ্টায় সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। নিপীড়িত শোষিত ভারতবাসী দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ভারত হইতে ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা ভারতবাসী মাত্রই জানেন। তাঁহার নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন এবং কোহিমার সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের আবসানের সূচনা করিয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বোম্বাই, করাচির নৌবিদ্রোহ, কলিকাতার রসিদ আলি দিবস সবই আজাদ হিন্দের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়াছিল। ব্রিটিশ পরিচালিত ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে এই প্রথম ভাঙন দেখা দিল। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দের বীর সেনানীদের বিচার সমগ্র ভারতে যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে ইংরাজ শাসকরাও বিচলিত হইয়া পড়িলেন—আজাদি সেনানীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। আজাদ হিন্দের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, ৪২ সালের গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরাজকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করিল। ৪৭ এর ১৫ আগস্ট কংগ্রেসের নিকট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন।

নেতাজী বলিয়াছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। দুঃখের বিষয় আজ ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ১১ বৎসর পরেও সেই শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনও কার্য্যকরী প্রচেষ্টাই দেখা যাইতেছে না। পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু দেশের চিরন্তন সমস্যাগুলি আজও অব্যাহত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ২৩শে জানুয়ারি নেতাজীর সেই আপসহীন সংগ্রামের নীতিই আবার আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার শোষণের আবসান ঘটাইতে হইবে। শ্রেণী সমস্যার সম্পূর্ণ ও চিরতরে সমাধান করিতে হইবে। এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত শোষিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন সার্থক হউক। ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন, নেতাজীর আদর্শের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হউক—আজকের দিনে এই আমাদের কাম্য। নেতাজীর জীবনের মূল স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তোলাই আমাদের ভারতবাসীদের আজকের সবচেয়ে বড় কাজ।

চিরসংগ্রামী বিপ্লবী মহানায়কের জন্মদিনে এই শপথ গ্রহণই আমাদের কর্তব্য।

২৩ জানুয়ররি, ১৯৬১।

নেতাজী জন্মোৎসব স্মারকগ্রন্থ

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন

কমরেড এবং সতীর্থ প্রতিনিধিবৃন্দ,

এই সম্মেলনে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এমন এক সময়ে এখানে সমবেত হয়েছি যখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের কোনও সম্মেলনের সভাপতি প্রথামাফিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন। আমিও তাই কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

সারা বিশ্ব আজ যুদ্ধের নতুন বিপদের সম্মুখীন। বার্লিন নিয়ে সঙ্কট, বিজের্তাতে ফরাসি হানা, কুয়েতে ব্রিটিশ সেনা সমাবেশ, কঙ্গোর জটিল পরিস্থিতি, কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন হস্তক্ষেপ। এসবই হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যুদ্ধ প্রস্তুতির কুৎসিত চিহ্ন। গত কয়েক বছর ধরে 'কৃষ্ণ মহাদেশ' আফ্রিকার সর্বত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই তা শক্তিশালী হচ্ছে। একটির পর একটি দেশ স্বাধীন হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। লাতিন আমেরিকা, মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসব দেশে পশ্চিমি শক্তিগুলি এতদিন পর্যন্ত সফলভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এসেছিল সেই সব দেশের মানুষ আজ বঞ্চনার অবসানে লড়াইয়ে নেমেছেন। পতনের অনিবার্যতাকে অনুভব করেই সাম্রাজ্যবাদীরা আজ উন্মাদ হয়ে উঠেছে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শান্তির জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির কিছু নমুনা এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী

আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রেখেছে। তবে আমি মনে করি না যে বর্তমানে শান্তি আন্দোলন অথবা শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিশ্বশান্তিকে সুনিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট। কঙ্গো এবং বিজের্তার ঘটনা থেকে প্রামাণ হয়ে গেছে, ছোট দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো এবং তাদের ওপর আক্রমণ চালানো বন্ধ করার ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলিকে বাধা দিতে রাষ্ট্রসংঘ অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবেই ব্যর্থ। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত, সংযুক্ত আরব আমির শাহি, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশও শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্র যথেষ্ট নয়। তাহলে সমাধানের পথটা কী? আমরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলার বিরোধী নই। কিন্তু সেই সুযোগ সীমিত। যে কথা বারবার বলেছি, সে কথাই আবার উচ্চারণ করতে চাই, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ না করে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান ঘটিয়ে কখনই নিরাপত্তা, শান্তি এবং মানবতার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বরং তাতে যুদ্ধের বীজই বপন করা হবে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে মুক্তি-যুদ্ধের পাশাপাশি স্বাধীন দেশগুলিতে পুঁজিবাদ নির্মূল এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই হতে পারে বিশ্বশান্তির একমাত্র নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

আমার পবিত্র কর্তব্য হল এই মঞ্চ থেকে আলজিরিয়া, কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা এবং ইরানের জনগণকে সার্বিক সমর্থন জাাননো যাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন, সমর্থন জানানো কিউবা, কঙ্গো, লাওস, তিউনিসিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সেইসব দেশের মানুষকে যাঁরা দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপের রিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

আমার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের হয়ে আমি সফল মহাকাশযান উৎক্ষেপনের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি মেজর গ্যাগারিন, মেজর তিতভ ও অন্যান্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের। এই ঘটনা সমস্ত দেশের মানুষের কাছেই উন্নতির নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

চীনা আক্রমণ

জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় ভারত ভূখন্ডে চীনা আক্রমণের ফলে যে নতুন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে আমি তা উল্লেখ করতে চাই। নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয় এমন একটি দেশ ভারতের মতো বন্ধু দেশের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে এবং তার ১২ হাজার বর্গ মাইল জমি দখল করে রাখতে পারে, এঘটনা বিশ্বাস করা সত্যই খুব কঠিন। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে। চীনা সৈন্যরা যে আমাদের জমি দখল করে আছে, এটাও বাস্তব। আমরা চীনা সরকারের আগ্রাসী

নীতির তীব্র নিন্দা করছি এবং দখল করা জমি ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। চীন বা পাকিস্তান বা অন্য যেই হোক না কেন, যে কোনও বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে দেশের ভৌগোলিক অখন্ডতাকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে আসবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই সূত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমান পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলরা। একদিকে তারা জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে নিজেদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তারা জনগণ থেকে বামপন্থীদের বিছিন্ন করতে চাইছে। চীনা আক্রমণের নিন্দা করতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। তারা ভারতের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষার পক্ষে, এরকম কোনও স্পষ্ট ঘোষণা রাখতেও ব্যর্থ হয়েছে। এই সুযোগ নিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলরা। কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার মধ্যে অবশ্য সম্প্রতি চীনের সমালোচনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যে কারণে এই পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তনও হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের মন থেকে বহিঃশক্তির প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে শঙ্কা এখনও মুছে যায়নি। চীনা আক্রমণ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়, সন্দেহের উর্দ্ধেও নয়। বিদেশি শক্তি যখন আমাদের এই বিশাল ভূখন্ড দখল করে রেখেছে তখন সরকার সেখান থেকে তাদের উৎখাত করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যে কোনও সরকারেরই প্রাথমিক দায়িত্ব। আমাদের সরকার যদি তাতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হবে। অযোগ্যের কোনও অধিকারই নেই ক্ষমতায় থাকার। সরকার হয় দেশকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করবে নয়তো প্রকাশ্যে নিজেদের অসমর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করবে।

এই ইস্যুতে আমরা যুদ্ধ চাই না। ভারত ও চীনের মধ্যে যদি সীমান্ত সমস্যা থাকে তাহলে তা আলোচনা করেই মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই আলোচনাকে যদি সফল করতে হয় তাহলে চীনকে অবশ্যই আগে দখল করা জমি ছেড়ে দিতে হবে।

কাশ্মীর ও পাকিস্তান

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে পাকিস্তান সরকার যখন-তখন ভারতের দিকে মুষ্ঠি তুলে ধরছে এবং কাশ্মীর আক্রমণ করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। কাশ্মীর হল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার ওপর পাকিস্তানের কোনও দাবিই থাকতে পারে না। একথা ঘোষণা করা এবং পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমান সামরিক সাহায্য দেওয়ার

ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আমি প্রাধানমন্ত্রী নেহরুকে অভিনন্দন জানাই। এই সব অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হতে পারে। একনায়কতন্ত্রী আয়ুবের একথা মনে রাখা উচিত যে যদি তার উন্মত্ততা কাশ্মীর অথবা ভারতের অন্য অংশের ওপর আক্রমণ চালাতে তাকে প্ররোচিত করে তাহলে সে এ-পক্ষ থেকে পাবে এক প্রবল চপেটাঘাত। যে কোনও পাকিস্তানি আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ভারতের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্ব বাংলার গোপালগঞ্জ এবং অন্যান্য কিছু জায়গায় সম্প্রতি সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং নিগ্রহের যেসব ঘটনা ঘটছে তা পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি এবং পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্রী শাসনে জনসাধারণের একাংশের সহায়ক আবস্থারই পরিচায়ক। সেখানকার জনসাধারণের সকল অংশেরই জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য যাতে প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে কূটনৈতিক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারকে আর্জি জানানোর জন্য আমি ভারত সরকারকে আর্জি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ভারতের জনসাধারণকেও অনুরোধ করব, এখানকার সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। সমস্যাটাকে দেখতে হবে গণতান্ত্রিক এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, এর সঙ্গে সম্প্রদায়গত ইস্যুকে যুক্ত করা ঠিক হবে না। শুধু নির্দিষ্ট কোনও বিশ্বাসে আস্থাশীল বলেই কোনও মহিলা বা পুরুষকে আক্রমণ করা অপরাধ। জব্বলপুরের দাঙ্গা ভারতের মুখচ্ছবিতে কালো ছাপ রেখে দিয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে বামপন্থী নেতাদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার এবং পাখতুন আন্দোলনের ওপর সরকারের দমন অভিযানকে যে কোনও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই সমালোচনা করবে।

গোয়া

এখনও গোয়া স্বাধীন নয়, এঘটনা লজ্জার। গোয়ার পর্তুগিজ শাসন ভারতের স্বাধীনতাকেই ভৎর্সনা করছে। ভারত সরকারের পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং গোয়া থেকে পর্তুগিজ শাসকদের হটিয়ে পর্তুগালে পাঠিয়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। এর পরেও সরকারের মধ্যে যদি দ্বিধাগ্রস্ততা থাকে তাহলে সরকারকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে হবে যে গোয়ার মুক্তি-বাহিনীর কাজে তারা কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

বেরুবাড়ি

ভারতের একটি অংশ বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব নিয়ে জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর সরকার যে জল ঘোলা শুরু করেছে তার নিন্দা করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বেরুবাড়ি ভারতেরই একটা অংশ, এর ওপরে পাকিস্তানের কোনও দাবিই থাকতে পারে না। কিন্তু সেবাপরায়ণ নেহরু পাকিস্তানের

দাবি মেনে নিয়েছেন এবং আট হাজার ভারতীয় নাগরিকসহ বেরুবাড়ির অর্ধেক পাকিস্তানকে উপহার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে তাকে অগ্রাহ্য করে এবং সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শকে অস্বীকার করে নেহরু সংবিধানকেই পাল্টে ফেলেছেন যাতে এই হস্তান্তর খুব সহজেই করা যায়। আমি পরিষ্কার জানাতে চাই, এ-ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনকে আমরা শেষ কথা বলে মেনে নিইনি। গত ২৬ জানুয়ারি বেরুবাড়ির মানুষ রক্ত দিয়ে শপথ নিয়েছে, পাকিস্তানের হাতে ওই অঞ্চল তুলে দেওয়ার জন্য সরকার যদি জরিপ বা অন্য কোনও ধরনের কাজ শুরু করে তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করা হবে। বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটির কর্মসূচিকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদের আশা, বেরুবাড়ির দুর্ভাগা মানুষ ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণেরই সমর্থন পাবে।

কংগ্রেসি অপশাসন

কংগ্রেসি অপশাসনে মানুষ এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভারতে চোদ্দ বছরের কংগ্রেস প্রশাসন সাধারণ মানুষের কোনও উন্নতিই করতে পারেনি। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং একটি সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এই সব পরিকল্পনায় খরচ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কিন্তু তাতে লাভ কী হচ্ছে? এই সমস্ত পরিকল্পনার যা ফল তা হল, ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব হচ্ছে আরও গরিব। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং চাকরির মতো জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির কোনও সমাধানই হচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রকৃত মজুরি কমে গেছে ভয়ানকভাবে, মানুষের জীবনযাত্রার মানও নেমে গেছে অনেক।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে চূড়ান্ত রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতেই পরিষ্কার হয়েছে তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর তুলনায় এবার আমাদের অর্থনীতিতে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রের ওপর। মোট ১১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনার মধ্যে ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে এই নতুন লগ্নির এক-চতুর্থাংশ যাচ্ছে শিল্প ও খনিজে। দ্বিতীয়ত এই পরিকল্পনায় বড় বেশি নির্ভর করা হয়েছে বিদেশি সাহায্যের ওপর, যার মোট পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বিদেশের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রত্যাশা পূরণ না-ও হতে পারে এবং ফলে বানচাল হয়ে যেতে পারে গোটা পরিকল্পনা। তাছাড়া এই বিশাল অঙ্কের বিদেশি সাহায্য আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তৃতীয়ত, আর্থিক ঘাটতির

ওপর নির্ভরতার পাশাপাশি পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ১৭০০ কোটি টাকার কর বসানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতিকালের একাধিক বাজেটের যে প্রবণতা তাতে কোনও সন্দেহই নেই যে এই বাড়তি করের বোঝার অধিকাংশটাই চাপবে গরিব মানুষের ঘাড়ে। চতুর্থত, এই পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা বাড়বে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা ৯০ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া পরিকল্পনাকালে থাকবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ আধা কর্মহীন মানুষ, যারা কাজের দাবি জানাবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যদি পরোপুরি কার্যকর হয় তাহলেও ১ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ পাবে না। অর্থাৎ এই সময়কালে ২ কোটি ৮০ লক্ষের মতো মানুষ কর্মনিযুক্তির বাইরে থেকে যাবে। পঞ্চমত, এই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। নীতি না থাকলে সাধারণ মানুষেরও তাতে কোনও উপকার হবে না। শ্রমিক-কৃষকরা যে ন্যায্য মজুরি পাবে, উপযুক্ত ব্যবহার পাবে, তাদের অবস্থার যে উন্নতি হবে এমন কোনও কথা এই পরিকল্পনায় বলা হয়নি। এই পরিকল্পনা বেসরকারি উদ্যোগকেই শক্তিশালী করেছে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা একদিকে যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর ন্যায্য দামকে অস্বীকার করেছে, জীবনযাত্রার মানের উন্নতিকে অগ্রাহ্য করেছে, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানকে অস্বীকার করেছে, তেমনই অন্যদিকে তাদের ওপর চাপিয়েছে বিশাল করের বোঝা।

যে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশে মদত দেওয়া হচ্ছে সে দেশে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল সমাজতন্ত্রের একটা অঙ্গ। আমাদের অর্থনীতিকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম টুকরো টুকরো পরিকল্পনা হতে পারে না। আমাদের দেশে এখন যেটা হচ্ছে সেটা কোনও পরিকল্পনা নয়, সেটা হল দেশের মানুষের স্বার্থকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে আমলাতন্ত্রের তৈরি একটা খিচুড়ি কর্মসূচি। এটা সমাজতন্ত্রের দিকে কোনও পদক্ষেপ নয়, এটা হল মিশ্র অর্থনীতি, যা মুমূর্ষু পুঁজিবাদেরই আর এক নাম।

অসমে বিধ্বংসী অভিযান ও ভাষা বিতর্ক

ভাষা হল ঐক্যের পক্ষে একটা বড় শক্তি। কিন্তু কোনও কোনও সময়ে এই ভাষা হয়ে ওঠে বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের অস্ত্র। গত দুবছরে ভাষার নামে আমরা অসমে অত্যন্ত জঘন্য ধরনের দাঙ্গা দেখেছি। কয়েক হাজার বাড়ি পুড়েছে, কয়েকশ মানুষ খুন হয়েছে, এমনকি মহিলদের নির্যাতন করা হয়েছে, শুধুমাত্র এই কারণেই যে তারা একটি বিশেষ ভাষায় কথা বলে। সেটা হল বাংলা ভাষা। অসম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ঘটনার নীরব দর্শক হয়ে থেকে এবং কার্যত

সংখ্যালঘুদের বাঁচাবার জন্য কোনও উদ্যোগই নেয়নি। এ ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে কেন্দ্রীয় সরকার কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণায় এত তৎপর, সেই কেন্দ্রীয় সরকার অসমের ক্ষেত্রে সেকথা একবারও ভাবল না। ভাবেনি কারণ কেরলে অ-কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা ছিল, কিন্তু অসমে কংগ্রেসের নিজের সরকার। গত জুলাইয়ে অসমে এই ব্যাপক দাঙ্গার সময় কর্তব্যে অবহেলার জন্য আমি দায়ী করব অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে।

অসমে এই রাজ্যিক ভাষা ইস্যু এবং বাঙালি ও অন্যান্য পার্বত্য উপজাতিদের সমস্যা অন্যান্য রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা একটা অত্যন্ত গভীর সমস্যা। এই সমস্যার যদি ঠিকমতো মোকাবিলা আমরা করতে না পারি তাহলে আমাদের জাতীয় ঐক্য বিপর্যস্ত হবে, এমনকি বিপন্ন হবে ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। এস আর পি সূত্র বলছে, যদি দেখা যায় কোনও রাজ্যে কোনও ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা সেই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, তাহলে সেই ভাষাকে ওই রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসম্মত। আমার প্রস্তাব হল, শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সম্মেলন ডাকুক, যার উদ্দেশ্য হবে সর্বভারতীয় স্তরে এই সমস্যার সমাধান করা।

সরকারি কাজে হিন্দির ব্যবহারের কথাও আমি উল্লেখ করতে চাই। ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দির প্রবর্তনকে আমরা সমর্থন করেছি। কিন্তু কারোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটা কখনই চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের গভীর অনুভূতির কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের বোঝাতে হবে এবং হিন্দি চালু করাব ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষাগুলিকে রক্ষা করার কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

পাঞ্জাবি যুদ্ধ

আমাদের পার্টি সব সময়েই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের কথা বলে এসেছে এবং সেই সূত্রে ভাষার ভিত্তিতে একটি পাঞ্জাবি সুবা গঠনের প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অকালিদের পাঞ্জাবি সুবার দাবি একটা সাম্প্রদায়িক অভিযানে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে পারস্পরিক ঘৃণার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে শিখ এবং হিন্দুদের মধ্যে। রাজনীতি বা ভাষাগত বিতর্ক বা রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে ধর্মকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই।

সাম্প্রদায়িকতা—ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা

সাম্প্রতিককালে জাতীয় জীবনে আর একটি শক্তির উত্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি হল সাম্প্রদায়িকতা। কেরলে নির্বাচনের সময় যখন মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেস এবং পি এস পি-র আঁতাত হয় তখন থেকেই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হতে শুরু করে এবং বর্তমানে তা বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে মাস কয়েক আগে যে মুসলিম সম্মেলন হয়েছে এবং সেখানে যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমরা কি মুসলিম লিগ এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সেইসব অতীত কাজকর্ম একেবারেই ভুলে গেছি, যে কাজের জন্য আমাদের মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে? মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের কারণেই পাল্টা শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে হিন্দু মহাসভা এবং জনসঙ্ঘের মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তৎপরতা ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। দিল্লিতে পাল্টা হিন্দু সম্মেলন করার যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তা নিন্দনীয়। দুঃখজনক ঘটনা হল, যে কংগ্রেস দল প্রায়ই জাতীয় ঐক্যের কথা বলে থাকে, তারাই নিজস্ব নির্বাচনী স্বার্থে এইসব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম সম্মেলনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং এবিষয়ে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকার বিরুদ্ধেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ধর্মীয় বা অন্যান্য যে কোনও সম্প্রদায়েরই যুক্তিগ্রাহ্য ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু তার সমাধান সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম নয়। জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেই একাজ সম্ভব।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, উভয়েই ব্যর্থ হয়েছে। উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সরকারি উদ্যোগকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু একই সঙ্গে আমি একথাও বলব, সেখানে যেতে কাউকে বাধ্য করা চলবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং উদ্বাস্তু সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইউরোপীয় কমন মার্কেট ও ভারত

ইউরোপীয় কমন মার্কেটে ব্রিটেনের ঢোকার সিদ্ধান্ত ভারত এবং কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশের বাণিজ্য স্বার্থকে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত করবে। বিস্ময়কর ঘটনা হল, ভারতের স্বার্থের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এই নগ্ন

বিশ্বাসঘাতকতার পরেও ব্রিটিশ সরকারের এবং কমনওয়েলথের প্রতি নেহরু সরকার তার মোহ কাটাতে পারছে না। এই অপমান কিন্তু আমরা সহ্য করব না। ভারতকে অবিলম্বে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কমন মার্কেটের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমি সরকারের কাছে আর্জি জানাব, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে নিয়ে কৃষক কমন মার্কেট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হোক।

জনগণের সংগ্রাম

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর যাঁরা সতর্ক চোখ রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে সম্প্রতিকালে সারা দেশেই গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য মানুষের সংগ্রাম প্রচন্ড শক্তি অর্জন করেছে। নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্যান্য ব্যর্থতা সত্বেও গত সাধারণ ধর্মঘটে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। এই ক'বছরে খেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, শহরের রাস্তায় লড়াই হয়েছে অসংখ্য। নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য এবং মূল্যবৃদ্ধি, বন্যা, মানুষের তৈরি নানা বিপর্যয়ের মোকাবিলায় ও স্বাধীনতা, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য অন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের সমর্থনে এদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে বারবার।

আমাদের প্রধান শত্রু পুঁজিবাদ

ভারতে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি এবং প্রশাসনই জনগণের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা আসে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের হাতে এবং তাদের হয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেস দল। তখন থেকেই ভারতীয় পুঁজিবাদের এজেন্ট হিসাবে কংগ্রেস কাজ করে যাচ্ছে। শিল্পে বেসরকারি মালিকানা বৃদ্ধি, শ্রমিক বিরোধী নীতি গ্রহণ, পূর্বতন রাজাদের পেনশন প্রদান এবং বিদেশি জাতীয় পুঁজির আঁতাত সহ বিদেশি পুঁজির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতে পুঁজিবাদী কাঠামো কীভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পুঁজিবাদী কাঠামোতে থেকে আমাদের জীবনের বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় জনগণের জন্য স্বাধীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এর জন্য দরকার সমাজতন্ত্র। আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্র অর্জন করা সম্ভব। শুধুমাত্র খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের 'ক্ষমতা দখলই' প্রতিষ্ঠা করতে পারে সমাজতন্ত্র। ইতিহাসের শিক্ষা নির্ভুল ভাবে আমাদের এই

শিক্ষাতেই পৌঁছে দেয়। কিন্তু সোভিয়েত তাত্ত্বিক এবং সি পি আই নেতাদের সম্প্রতি কথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সূত্র, সংসদীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব সাধারণ মানুষের অনেকাংশের মধ্যেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এটা অসম্ভব। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, অথবা গুয়াতেমালার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের ধারণাকেই সঠিক প্রমাণ করে। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কংগ্রেসি নীতি এবং কেরলে সি পি আই-এর ক্ষমতা দখলের প্রয়াস আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণতি কী হতে পারে। সংসদীয় মোহ থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে, প্রস্তুত হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য। এখনই হয়ত একাজ করে ফেলা যাবে না, কিন্তু একাজ করার জন্য আজ থেকেই প্রস্তুতি শুরু করা যেতে পারে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন

তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস কখনই বাস্তব সম্পর্কে অন্ধ করে তোলে না, বরং বাস্তববোধ গড়ে তোলে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। এইসব নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে আমাদের বেআব্রু করতে হবে, তা থেকে সরিয়ে নিতে হবে জনগণকে। কংগ্রেসি শাসনে মানুষ এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তারা চাইছে বিপক্ষ সরকারকে বসাতে। জনগণের এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে প্রকাশ করা, তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার এবং বিকল্প বামপন্থী সরকার গঠনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমরা জানি, এইসব সরকার সমাজ-আর্থনীতিক পরিস্থিতিকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারবে না। তবে সাধারণ মানুষের কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে সামান্য স্বস্তি এনে দেওয়া যেতে পারে। কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই হবে এবং যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানেই সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট

কোনও রাজ্যেই কোনও বামপন্থী দলের একক ভাবে কংগ্রেসকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আমি তাই সি পি আই এবং পি এস পি সহ দেশের সমস্ত বামপন্থী দলকে গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং প্রগতিশীল মানুষের কাছে আবেদন জানাব, কংগ্রেসকে মোকাবিলা করার জন্য বৃহত্তর সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলুন। বিভিন্ন

বিষয়ে এই সব দল এবং সংগঠনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে 'একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির' ভিত্তিতে এইসব শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টি এব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে এবং কিছুটা এগোনও গেছে। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, এবং বোম্বাইয়ে আমাদের যে সব কমরেড আছেন, তাঁরাও একই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

বাম ঐক্য ও মার্কসবাদী শক্তিগুলির সংহতি

দেশে বাম ঐক্য এবং মার্কসবাদী শক্তিগুলির সংহতির সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। জনগণের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সবসময়েই বাম ঐক্যের ওপর নির্ভর করেছি এবং তাকে আরও জোরালো করার চেষ্টা করেছি। এই ধরনের ঐক্য কিন্তু গড়ে উঠতে পারে শুধুমাত্রই গণমুখী একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচির ভিত্তিতে। সম্প্রতি অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা আর এস পি, আর সি পি, বলশেভিক পার্টি, পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পাটি, স্যোসালিস্ট পার্টির একটি অংশ এবং আমাদের পার্টি অর্থাৎ যারা মার্কসবাদ এবং বিপ্লবী কর্মসূচিতে বিশ্বাস রাখে তাদের একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি। একাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এই ধরনের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির উত্থান দাবি করছে। আমি নিশ্চিত যে সময়কালে এটা একটা নির্দিষ্ট চেহারা পাবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ দল জন্ম নেবে। এই লক্ষ্যের দিকে এক পা এগিয়ে সমস্ত ইস্যুতেই এই সব দলের একটা যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান আমি জানাব।

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। স্বাধীনতার পর ১৪ বছর পার হয়ে গেছে, অথচ কি কেন্দ্রীয় সরকার , কি রাজ্য সরকারগুলি, কেউই এখন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। একথা সত্যি যে নেতাজীর কোনও সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না, দেশের মানুষের হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু নেতাজীকে সম্মান জানাতে সরকার যে কিছুই করেনি এ ঘটনা দুঃখের এবং লজ্জাকর। এর পেছনে কি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, নাকি আছে সরকারের কয়েকজন নেতার নেতাজীর বিরুদ্ধে

ব্যক্তিগত অসহিষ্ণুতা? আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি ঃ

ক. দিল্লিতে লাল কেল্লার সামনে নেতাজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরকে 'নেতাজী সুভাষ নগর' নামে চিহ্নিত করতে হবে।

গ. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম দিতে হবে স্বরাজ এবং শহিদ দ্বীপপুঞ্জ।

ঘ. নেতাজীর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

সংগ্রামের আহ্বান

কমরেড, আমি যথেষ্ট সময় নিয়েছি। আমার ভাষণ শোনার জন্য আমি আর আপনাদের আটকে রাখব না। পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। বিদেশি শাসনের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করতে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আজ থেকে ২২ বছর আগে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা এখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার জন্যই ফরওয়ার্ড ব্লক তার অস্তিত্বকে রক্ষা করবে। সমস্ত রকম ত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে আমাদের মুক্ত করতে হবে নিজেদের এবং প্রস্তুত হতে হবে আগামী সংগ্রামের জন্য। জয় হিন্দ।
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
ফরওয়ার্ড ব্লক দীর্ঘজীবী হোক।
নেতাজী দীর্ঘজীবী হোন।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ। নয়াদিল্লি। ১৮ থেকে ২০ আগস্ট, ১৯৬১।

চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

সতীর্থ প্রতিনিধি এবং কমরেডরা,

এক অত্যন্ত সঙ্কটজনক সময়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। চীনের নগ্ন আক্রমণের ফলে ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা আজ বিপন্ন ভারতের সমস্ত সন্তানের আজ পবিত্র কর্তব্য হল মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য শক্তভাবে রুখে দাঁড়ানো। ফরওয়ার্ড ব্লক হল জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য এবং দেশপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন একটি সমাজতন্ত্রী দল। আমাদের জাতীয়তাবাদ আমাদের দেশকে ভালবাসার, জাতির জন্য কাজ করার শিক্ষা দিয়েছে। অন্য দেশকে আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেনি। চীনা আক্রমণের ফলে যে জাতীয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা নিয়ে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, আমাদের পবিত্র ভূমি থেকে শত্রুদের বিতাড়ণের জন্য আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনার জন্যই পার্টির এই বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকা হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য ও সমর্থকরা ইতিমধ্যেই তাঁদের নিজেদের এলাকায় এব্যাপারে কাজ শুরু করেছেন।

চীন বা পাকিস্তান বলে কথা নয়, যখনই সীমান্ত লঙঘনের কোনও ঘটনা ঘটেছে তখনই ফরওয়ার্ড ব্লক তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং দেশের প্রতিরক্ষায় শামিল হয়েছে। বিদেশি আক্রমণকারী আমাদের সরকারের দুর্বল নেতারা যখনই আমাদের মাতৃভূমির ভৌগলিক অখণ্ডতাকে নষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে তখনই আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। পাকিস্তানের হাতে বেরুবাড়ি তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছে আমাদের পার্টি। কারণ এই প্রস্তাবের অর্থ হল ভারতের জমিকে খণ্ডিত করা। ১৯৫৯ সালে যখন ব্যাপক চীনা অনুপ্রবেশের খবর সাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছল তখনই এই আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতিকে সংহত করার কাজ ফরওয়ার্ড ব্লক শুরু করে দেয়। তখন থেকেই আমরা চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে বারবার দাবি জানিয়ে এসেছি। ফরওয়ার্ড ব্লকের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখেই জাতির পক্ষে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ আপনাদের এখানে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

চীনের দাবি অযৌক্তিক

ভারতের ওপর চীনের আক্রমণ হল বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী ও শান্তিপ্রিয় একটি দেশের প্রতি নগ্ন বিশ্বাসঘাতকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতাকে ব্যাপকভাবে লঙঘন করা। মারাত্মক আঘাত এবং বিস্ময় হিসাবেই তা আমাদের কাছে এসেছে। চীনের দাবি, ভারত ও চীনের মধ্যে যে সীমান্ত রেখাগুলি এখনও চিহ্নিত হয়নি সেগুলি কখনই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে সনাতনী রেখা এবং পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইনই চীনের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত। চীনের বর্তমান সরকারের পূর্বসূরীরা তা মেনে চলেছিলেন। এমনকি ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর মাও-ৎসে-তুং এবং চৌ এন লাই-এর সরকারও এই সীমান্ত অনুমোদন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের গৃহীত নীতি হল, পর্বতমালা অঞ্চলে দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হবে নদীর জলপ্রবাহের গতিপথকে ধরে। লাদাখ এবং নেফা অঞ্চলে আমাদের সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছে এই নীতি মেনেই। সীমান্ত নিয়ে চীনের কোনও বক্তব্য থাকতেই পারে, এমনকি মতপার্থক্যও। কিন্তু এই মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চীন যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা বর্বরোচিত, জঙ্গলের যেমন আইন হল 'জোর যার মুলুক তার' ঠিক সেই পথই নিয়েছে সে। যদি কোনও বিরোধ বা মতপার্থক্য থাকে তাহলে তা আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে। চীন যে পঞ্চশীল নীতি মেনে নিয়েছিল তার মূল বক্তব্যও ছিল তাই।

চীনের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ

একথা এখন পরিষ্কার যে চীনের সম্রাটরা বিভিন্ন সময়ে যেসব ভূখণ্ড দাবি করেছিলেন চীন এখন সেগুলিই দাবি করতে চাইছে। কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলেও চীন সরকার সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক সমস্ত দিকই আত্মস্থ করেছে।

চীন সমাজতন্ত্র এবং শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত রুচি এবং সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত প্রকাশভঙ্গীর শিকার হয়েছে। ক্ষমতার উন্মাদনায় যুগে যুগে সম্প্রসারণবাদী নীতি নিয়ে চলেছিল যে হুণরা, তাদের কুপ্রভাবই চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের এই আগ্রাসী মনোভাবের পেছনে কাজ করছে। চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রকৃতিই প্রমাণ করবে যে জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও চীন সমাজতন্ত্রকে অনুসরণ করে নি। সর্বত্রই জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে।

আক্রমণকারীদের হঠাও

একথা ঠিক, আমাদের অপ্রস্তুত থাকার সুযোগ নিয়ে চীন লাভবানই হয়েছে, দখল করে নিয়েছে বিশাল ভারত-ভূখন্ড। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চীনা আক্রমণকারীদের হঠানোর জন্য গোটা জাতি এক হয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং আমাদের যুদ্ধ অভিযানকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা চলে। এবং অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের সাহসী জওয়ানরা সীমান্তে অত্যন্ত কষ্ট করেই লড়াই করেছেন। আমরা তাদের প্রতি আমাদের উষ্ণতম অভিনন্দন জানাই। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা।

ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক মতামত ইত্যাদি সমস্ত পার্থক্যকে ভুলে গিয়ে সারা দেশের মানুষ আজ এক হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও অখন্ডতাকে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং যতদিন ভারতের মাটিতে একজনও চীনা সৈন্য থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের লড়াই চালিয়ে যাবে।

ভারত ভূখন্ড চীনকে ছেড়ে দিতেই হবে। লাদাখের সনাতনী রেখা এবং নেফা অঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইনের ওপারে তাদের চলে যেতেই হবে। চীনের ১৯৬২ সালের ২১ নভেম্বরের যুদ্ধ বিরতির সুচতুর প্রস্তাব কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যাবে না। ১৯৫৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চীনের যে অবস্থান ছিল তা যদি মেনে নেওয়া হয় এবং চেকপোস্ট বানানোর ব্যাপারে তাদের প্রস্তাবে যদি ভারত রাজি হয় তাহলে ভারতের বিরাট ভূখন্ড চলে যাবে চীনের দখলে, এবং ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ রচনার ব্যাপারে তারা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে।

এটা ঠিক যে চীন এখন আক্রমণ বন্ধ করেছে। এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। ভারতের জনগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডারকে আরও শক্তিশালী করা, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত এবং চীনের এই আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাল চোখে না দেখা ইত্যাদি ঘটনাই সম্ভবত এই যুদ্ধবিরতির মূল কারণ। কিন্তু চীনের ভাবভঙ্গী মোটেই সহায়ক নয়। যে

কোনও মুহূর্তে তারা নতুন করে আক্রমণ চালাতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে তাই কোনও রকম শৈথিল্য আনা চলবে না। আমাদের ভূখন্ড থেকে শেষ চীনা সৈনিকটিকে আগে সরাতে হবে।

কলম্বো দৃষ্টিভঙ্গী।

ছটি জোট-নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের কলম্বো সম্মেলনের ফলাফলে আমরা হতাশ। এই সম্মেলন চীন-ভারত যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে নি। শান্তিপ্রিয় এক প্রতিবেশী দেশের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য চীনকে নিন্দা করে নি, পঞ্চশীল এবং বান্দুং নীতি লঙঘনের জন্য এবং আফ্রো-এশীয় সংহতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য চীনকে ধিক্কার জানায় নি। তা না করেই এইসব 'নিরপেক্ষ' দেশ আক্রমণকারী চীন এবং আক্রান্ত ভারতকে একই ওজনে ফেলেছে। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ভারত-চীন সংঘাতের সমাধান করতে পারবে না, ঠিক তেমনই ভবিষ্যতে এই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কেন আন্তর্জাতিক আদালত?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে চীনের সঙ্গে আমাদের 'সীমান্ত বিরোধের' বিষয়টি হেগ-এ আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠানো হতে পারে। অত্যন্ত খোলাখুলি বলছি, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করছি না। আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি এটাই যে চীনের সঙ্গে আমাদের একটা 'সীমান্ত বিরোধ' আছে এবং সেই বিরোধ মেটানোর জন্য তৃতীয় একটি পক্ষের সাহায্য দরকার? এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। ভারত এবং চীনের মধ্যবর্তী সীমান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই চিহ্নিত এবং সুনির্দিষ্ট রয়েছে। নতুন করে তার কোনও পরীক্ষা বা অদলবদলের প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন সেটা হল, আমাদের সীমান্তের ওপারে চীনাদের চলে যাওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে এলে সেটা আমাদের ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি বিশ্বাসহন্তার কাজ হবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনও রকম আপস নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে কোনও রকম আলোচনার বিষয় করাও চলবে না। কাশ্মীর নিয়ে যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হয়েছে, আশা করব তিনি তা থেকে শিক্ষা নেবেন।

পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ নয়

কাশ্মীর নিয়ে আমাদের সরকারের সম্ভাব্য দোদুল্যমানতা সম্পর্কেও আমি সতর্ক করতে চাই। আমরা পাকিস্তান এবং সেদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু কখনই তা আমাদের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে নয়। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গ। এই মৌলিক বিষয়টি নিয়ে কোনও চাপের কাছেই আমরা মাথা নত করব না, এমনকি যারা আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের কাছেও নয়। নেহরু কখনই তোষামোদের নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। পাকিস্তানকে যদি একবার তোষামোদ করা শুরু হয়, তাহলে চীনকেও আমাদের তা করে চলতে হবে এবং এর কোনও শেষ নেই।

সরকারকে সমর্থন

আমরা জানি চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার অনেক ভুল করেছে এবং আমাদের বিদেশ নীতিও নানাবিধ দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। ভারতের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গত কয়েক বছর ধরে চীন সরকার যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সেদেশে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূতরা কী করছিলেন? চীনা অনুপ্রবেশকারীরা ১৯৫৫ সালে যখন ভারত ভূখন্ডে ঢুকে পড়েছিল (বারাহতি) এবং ১৯৫৯ সালে আমাদের ১২ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করে নিয়েছিল তখন আমাদের সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেয় নি কেন? লাদাখে আকশাই চীন অঞ্চলে চীনারা যখন সিনকিয়াং-তিব্বত সড়ক নির্মাণ করে তখন আমাদের সরকার কী করছিল? প্রতিবছর আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট অর্থের অর্ধেক প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ হলেও সীমান্তগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় নি কেন? এই সব অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর কংগ্রেস সরকার দিতে পারবে না। কিন্তু এই সব ভুল সত্ত্বেও, আমি স্বীকার করব, সরকার এখন ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং শত্রুদের মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং তাঁর সরকারকে অভিনন্দন জানাই। আশা করব তাঁরা তাঁদের এই সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা নেবে তাকে আমরা অবশ্যই সমর্থন করব।

যুদ্ধ অভিযানকে সবরকম সাহায্য কর

আমি জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য ও সমর্থকদের কাছে আবেদন জানাব, জাতীয় প্রতিরক্ষা ভান্ডারে উদার হস্তে দান করুন, জাতীয় প্রতিরক্ষা বন্ড কিনুন, সোনা এবং সোনার গয়না এই ভান্ডারে দিন, জওয়ানদের জন্য রক্ত দান করুন এবং তাঁদের জন্য উলের জামাকাপড় তৈরি করুন। ছাত্ররা এন সি সি-তে যোগ দিন। অন্যান্যরা হোম গার্ডে যোগ দিন, রাইফেল ট্রেনিং বা এই ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাঁরা সক্ষম তাঁরা পরিষেবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দিন। অবিলম্বে সারা দেশে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করা দরকার।

আই এন এ কর্মীদের নেওয়া হোক

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন কর্মীদের সেনাবাহিনীতে নেওয়ার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছি। জাতীয়তাবোধ এবং পরিশ্রম ক্ষমতা ছাড়াও অঞ্চলে লড়াই করার অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। গত মাসে আমাদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড হালদুলকর এবং অন্যান্য পার্টি নেতারা যখন নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বলেছিলেন, আই এন এ কর্মীদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হবে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চবনও একই কথা বলেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এব্যাপারে কিছুই করা হয় নি। দ্রুত একাজ করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব।

প্রতিরক্ষা প্রয়াসে সঙ্কীর্ণ পার্টি রাজনীতি!

খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠন সহ সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ আজ যখন চূড়ান্ত উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ অভিযানে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই তাদের এই পরিষেবাকে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। সরকারের পক্ষে এটা নিছক বাদ পড়ে যাবার কোনও ঘটনা নয়। আমি জানি, অনেক ক্ষেত্রেই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী দলগুলিকে অসামরিক প্রতিরক্ষার বাইরে রেখে দিয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা নিয়ে এই ধরণের রাজনীতির খেলা অবশ্যই অপরাধ। আমি সরকারকে এই ধরণের সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করার জন্য এবং দেশপ্রেমিক মানুষের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করব। সমস্ত স্তরের প্রতিরক্ষা কমিটিতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

আমার কর্তব্য ঠিকমতো পালন করা হবে না যদি না আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ না করি। তারা আবার প্রমাণ করেছে যে তারা জাতির প্রতি অনুগত নয়। এই পার্টি চলে মস্কো এবং পিকিং-এর নির্দেশে। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় এবং আমাদের প্রিয় নেতা নেতাজীর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ লাড়াইয়ের সময় মস্কোর নির্দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় নেমেছিল। এখন অধিকাংশ কমিউনিস্টই ভারতের বিরুদ্ধে চীন সরকারের আক্রমণকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। একথা সত্য যে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ সম্প্রতি চীনাদের আক্রমণকারী

হিসাবে অভিহিত করে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু তাদের এই গৃহীত প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করা খুবই কঠিন ব্যাপার। চীন যে ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এঘটনা অনুধাবন করতে তাদের তিন বছর সময় লেগে যাওয়া কি বিস্ময়কর নয়? চীনের বিরুদ্ধে প্রস্তাবকে জাতীয় পরিষদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য সমর্থন করেননি। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কী? প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেও খবর পাওয়া গেছে, কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্যই এই ধরণের মন্তব্যে উস্কানি দিচ্ছেন যে, সমাজতন্ত্রী চীন ভারত আক্রমণ করতে পারে না, ম্যাকমেহন লাইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি, ভারত-চীনের বর্তমান যুদ্ধের জন্য ভারতই দায়ী ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, এস এ ডাঙ্গে এবং অন্যান্যদের দ্বারা নির্ধারিত কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতি মস্কোকে অনুসরণ করছে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে মস্কো ও পিকিং-এর মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। কিন্তু ধরা যাক, আগামীকাল মস্কো এবং পিকিং-এর মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেল এবং চীনের সমর্থনে এগিয়ে এল মস্কো। তখন কমরেড ডাঙ্গে এবং তাঁর বন্ধুরা কী করবেন? এই ধরনের জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিগুলি সম্পর্কে আমাদের তাই সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশের প্রতি অনুগত কোনও দলকে বিশ্বাস করা যায় না। ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো একটি দেশপ্রেমিক দলের পক্ষে বিশ্বাসঘাতক সি পি আই-এর সঙ্গে কোথাও কোনও ফ্রন্ট গড়ে তোলা যায় না।

কমিউনিস্টরা সম্ভবত বিশ্বাস করেন যে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় চীন সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে সমাজতন্ত্র কখনই বাইরে থেকে আমদানী করা যায় না। কোনও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব শুধুমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী সংঘর্ষকে তীব্রতর করে তুলে এবং সেটা একাধিক পরিস্থিতিগত কারণের ওপর নির্ভর করে। আমরা ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব আমাদের ক্ষমতাতেই। চীনা বাহিনী এক্ষেত্রে কোনও সাহায্য করতে পারে না, বরং উল্টে তাতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ারই ক্ষতি হবে।

অসৎদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

জাতীয় সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে যেসব অসৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মুনাফা লোটার চেষ্টা করছে তারাও আমাদের শত্রু। চীনা আক্রমণকারীদের তুলনায় তারা কিছুমাত্র কম বিপজ্জনক নয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। শিল্পপতিরা চেষ্টা চালাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য, চলছে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই। এসব কাজের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ

করব। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই এবং অন্যান্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে জনসাধারণকে। এই ধরনের অসৎদের যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবে এবং সমস্তরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে। আমরা সরকারকে সমস্তরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু সরকার যদি নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করতে চায় এবং শোষকদের সাহায্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জোরদার লড়াইয়ে নামতে হবে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে সাবধান

ভারতের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার জন্য, উল্টোমুখো করার জন্য বর্তমান সঙ্কটকে কাজে লাগাচ্ছে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। তারা দাবি জানাচ্ছে, সরকার জোট নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ-মার্কিন শিবিরে যোগ দিক। জোট - নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ হবে আত্মহত্যারই শামিল। এই নীতির জন্যই ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এত সমর্থন পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সহযোগী দেশগুলি চীনকে সমর্থন করার প্রশ্নে যে দ্বিধাগ্রস্ত তার কারণও এটাই। এইসব অসৎ মানুষ চাইছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতি এবং সমাজতন্ত্রের ভাবনাকে যাতে আমরা বাতিল করে দিই। চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে সস্তা সেন্টিমেন্টে আঘাত করে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চাইছে মার্কসবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম এবং লাল পতাকার বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির প্রচার চালাতে। দক্ষিণপন্থীদের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। চীনের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা কিন্তু মার্কসবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস তা সামান্যতমও নষ্ট করতে পারেনি। বরং আমাদের সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। এই পথ থেকে যে কোনও রকম বিচ্যুতিই আমাদের উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

নেতাজীর পথে চলুন

এই সঙ্কটকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। আমরা নেতাজীর অনুগামী এবং নেতাজী আমাদের শিখিয়েছেন, শত্রুর সঙ্গে কোনও আপস নয়, সাফল্যের জন্য চাই আপসহীন সংগ্রামের কর্মসূচি। নেতাজীর আদর্শ প্রচারের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তাঁর জীবন ও আদর্শ থেকে মানুষ পাবে প্রেরণা। নেতাজী আমাদের সামনে রেখেছেন মূল মন্ত্র 'ইত্তিফাক, এতমাদ, কুরবানি' (ঐক্য, বিশ্বাস, ত্যাগ) এবং আহ্বান জানিয়েছেন : তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

সতীর্থ প্রতিনিধিবৃন্দ, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আপনারা সমস্যাগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন এবং এমন সিদ্ধান্ত নিন যা শুধু ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদেরই উৎসাহিত করবে না, গোটা জাতিকে বিজয়ের পথ দেখাবে।

আপনারা এই বিশেষ অধিবেশনে যখন যোগ দিয়েছেন তখন স্বভাবতই দেশের বর্তমান অন্যান্য সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও আপনাদের আলোচনা করতে হবে। আপনাদের আলোচনা করতে হবে সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও, কারণ একমাত্র পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারলেই আমাদের পক্ষে সীমান্তের এবং দেশের ভেতরে অবস্থানরত শত্রুদের পরাজিত করা সম্ভব হবে।

শেষ করার আগে আমি আমার এবং আপনাদের তরফ থেকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করার জন্য ভোপালের কমরেডদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কমরেড, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন, নেতাজী যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শকে তুলে ধরার ডাক দিয়েছিলেন তাকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন। আমাদের লড়াইয়ের মূল কারণ যেহেতু সঠিক, তাই জয় আমাদের অনিবার্য। জয় হিন্দ।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশেষ
প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।
ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ। ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬২।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল সংগ্রামে জ্বলন্ত প্রেরণা-স্বরূপ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শাসন অবসানের আন্দোলনে দেশবাসীকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ধনিক শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথনির্দেশ করেছেন। স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র,—জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতা।

দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের আপসমূলক নীতির ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যেদিন স্তব্ধগতি হবার উপক্রম হয়েছিল, সেদিন সুভাষচন্দ্রের আপসহীন সংগ্রামের কার্যক্রমই দেশবাসীকে পথের সন্ধান দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সারা দেশ সাম্রাজ্যবাদ-বিতাড়নের সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। গান্ধীনেতৃত্ব এই সংগ্রাম চেতনার গতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে এবং তারই পরিণতি গান্ধীজী তথা উর্দ্ধতন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতান্তর ও ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন। আপস নয়, ভিক্ষা নয়, শোষকের শুভবুদ্ধি উদয়ের ভরসায় অপেক্ষা নয়, শত্রুর সঙ্গে আপসহীন সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ—সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বামপন্থী সংগ্রাম প্রচেষ্টা, ৪২ বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ও পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের শ্রমিক-কৃষক- নৌসৈন্য-পুলিশের অভ্যুত্থানের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। শান্তিপূর্ণ পথে, অহিংসার সাহায্যে এই স্বাধীনতা আসেনি। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সুবিধাবাদী আপস প্রচেষ্টার ফল দেশ বিভাগ ও বিদেশি পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ।

নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন নেতাজী দেখেছেন। স্বাধীনতার পর ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছবার কোনও সম্ভাবনা নেই। শোষক ধনিক শ্রেণী স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করবে, এ আশা করা ভুল। একমাত্র বিপ্লবের সাহায্যেই সমাজতন্ত্র অর্জন সম্ভব। শ্রমিক , কৃষক ও মধ্যবিত্তের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। মেহনতী মানুষের সংগঠনকে মজবুত করে বিপ্লবের পথে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই আজকের দিনে নেতাজীর আদর্শ অনুসরণের পথ।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নেতাজী কঠোর সংগ্রাম করেছেন এবং অসীম দুঃখ ও কষ্টের পথ অনুসরণ করেছেন। দাসত্বের মতো পাপ আর কিছু নেই; এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি জীবন পণ করেছেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার এক বিরাট বিস্ময়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবময় অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চীনের বর্বর আক্রমণের ফলে ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডত্ব আজ বিপন্ন। মত ও পথের পার্থক্যের উর্দ্ধে উঠে সমগ্র দেশ চীনা হানাদারদের বিতাড়ন ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা রক্ষার এই পবিত্র যুদ্ধে নেতাজীর জীবনাদর্শ, বীরত্ব ও সংগ্রাম-কৌশল আমাদের পথের নিশানা হবে। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং নেতাজীর অগ্নিগর্ভ বাণী দেশবাসীকে মরণপণ অভিযানে অনুপ্রাণিত করবে।

বর্তমান বৎসরে নেতাজীর শুভ জন্মদিবসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। স্বামীজীর আদর্শে নেতাজী তাঁর জীবন গড়ে তুলেছেন। যে বিবেকানন্দ বিপ্লবী আন্দোলনের উৎস ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং যিনি দরিদ্র নিপীড়িতের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন ও আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন, সেই বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের জীবনের আদর্শ। স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও আদর্শনিষ্ঠা নেতাজীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বামিজী ও নেতাজীর আদর্শ আমাদের নতুন সমাজ গঠনের ভিত্তি হোক।

নেতাজী দেশবাসীকে লক্ষ্যে উপনীত হবার চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। তাঁর আহ্বান, "তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব।" আজ ডাক এসেছে এই আহ্বানে সাড়া দেবার।

২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৩।
নেতাজী জন্মোৎসব স্মারক গ্রন্থ।

মুক্তিযোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২৩শে জানুয়ারি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণীয় ২৩শে জানুয়ারি।

জন্মনেতা সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে নেতাজীর পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোনও নেতা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এতখানি বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারেননি, সারা দুনিয়াব্যাপী এত শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি।

ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত এই দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবন-গাথা সারা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। তাঁর নেতৃত্ব দেবার নির্ভুল ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্য সারা দেশ তাঁকে নেতার আসনে বসাতে কোনও দ্বিধা করেনি। ত্যাগ, সংযম, লোভহীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনার ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করবার কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছেন। কেবল মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন সবসময় যে একটা বৃহৎ কর্মকান্ডের অনুষ্ঠান, দেশের মঙ্গলের জন্য একটা মহৎ ব্রত উদযাপন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তাই তো আমরা দেখতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন দেশমাতৃকার সাধনায় উৎসর্গীকৃত। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবের ঔদ্ধত্বের ও হীনসত্ত্বার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড প্রতিবাদ তৎকালীন ইংরাজদের অসভ্য উক্তিগুলিকে যেমন সংযত করতে পেরেছিল তেমনই যুবসমাজের কাছে নির্ভীক এক নেতার আত্মপ্রকাশকে সুনিশ্চিত করেছিল। জাতীয়তার বিরুদ্ধে বিরূপ আচরণের যেমন

তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন তেমনই গণদেবতার পূজারী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত সুভাষচন্দ্রকে তাই আই সি এস পদে চাকরির মোহপাশে বেঁধে রাখা যায়নি, তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের বহু বীরত্বময় সংগ্রামের কাহিনী সমগ্র ভারত আজও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে। বিশেষ করে ১৯৩০ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র থাকাকালীন সময়ে সুভাষচন্দ্রের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

১৯৩৯ সাল ভারতের জাতীয় জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। সারা দুনিয়াতে তখন যুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একটা বিরাট মহাযুদ্ধের আভাস নেতাজী বহুপূর্বেই পেয়েছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেসের তৎকালীন আপসমুখী নেতৃত্বকে চরম আন্দোলনের পথে আগুয়ান হতে আহ্বান জানান। ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেও তিনি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যাবার জন্য চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। আবার তিনি কংগ্রেসকে বললেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়েই বিপর্যস্ত ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়াবার সুযোগ নিতে হবে। যুদ্ধকালীন অবস্থাকে আমাদের কাজে লাগাতেই হবে। কিন্তু সেদিনকার আপসমুখী নেতৃত্ব তাঁর সেই চরম প্রস্তাবে সাড়া দিল না। নেতাজীর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়ই হল তৎকালীন 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। ইতিহাস স্বীকার করছে আজ যে নেতাজীর ভবিষ্যতদৃষ্টিকে সত্য প্রমাণ করে ১৯৪২ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর গান্ধীজীই এগিয়ে এলেন 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নিয়ে।

চিরবিদ্রোহী নেতাজী কিন্তু সেদিন অনেক দূরে। ভারতবর্ষ থেকে অনেক অনেক দূরে।

ব্রিটিশ সরকারের সদা-জাগ্রত প্রহরা এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হল কাবুল হয়ে তাঁর বার্লিন গমন, জার্মানি ও ইতালিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন, তাতে সফল হবার সম্ভবনা কম দেখে জার্মান ইউবোটে ভারত মহাসাগরে আগমন ও মালয়ে পদার্পণ এবং সেখানে এক বিরাট শক্তিশালী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন এবং কোহিমার সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সূচনা করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের

আন্দোলন ও সংগ্রামের খবর দেশের ভেতর প্রতিটি স্তরের মানুষের মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করল। যুসমাজ মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের শেষ আঘাত হানার জন্য এগিয়ে এল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। বোম্বাইয়ে, করাচিতে নৌবিদ্রোহ, কলকাতায় রসিদ আলি দিবসে ছাত্রদের প্রচন্ড সংগ্রাম, সবই যে আজাদ হিন্দের আন্দোলনেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।ব্রিটিশ চালিত ভারতের সেনাবাহিনীর ভেতর এই প্রথম ভাঙন দেখা গেল। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দের বীর সেনানীদের বিচার সমগ্র ভারতে যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল তাতে ইংরেজ শাসকরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আজাদী সেনানীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। আজাদ হিন্দের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, ৪২ সালের গণআন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিল। তারই ফলে ৪৭-এর ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল।

পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার পর দেশে শ্রেণীহীন, শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্রত ছিল। 'সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয় জনতার হাতে তুলে ধরবার মহান ব্রত ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সমাজতন্ত্রী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিণতিই সমাজতন্ত্র, এটা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতিই সুভাষচন্দ্রকে তৎকালীন আপসমুখী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল এবং যার ফলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বার হয়ে আসতে হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর বক্তৃতায় তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "আপনাদের জানা প্রয়োজন, আমাদের ঈপ্সীত লক্ষ্য দুটি। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটি জাতীয় বিপ্লব। অপরটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা; এটি সমাজ বিপ্লব।" স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্ত আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে সংহত রূপ দিয়ে তিনি দ্বিতীয় ধাপে শোষণহীন এক সমাজ কায়েম করতে গিয়ে যে কার্যপন্থা ঘোষণা করেছিলেন ('বামপন্থার অর্থ', কাবুল, ১৯৪১) তা হল, (১) একটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, (২) দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ভারী শিল্পোৎপাদন, (৩) উৎপাদন ও বন্টনের সামাজিকীকরণ, (৪) ধর্মের বিধায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, (৫) সকলের সমান অধিকার, (৬) ভারতীয় জনগণের সকল অংশের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা ও (৭) স্বাধীন ভারতে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতির প্রতিষ্ঠা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে কী হয়েছে ও কী হয়ে চলেছে, তার ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয় বলেই সেদিক থেকে বিরত থেকে শুধু

প্রতিটি মানুষকে আজ নেতাজীর আদর্শকে ও পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য আহ্বান জানাই। আহ্বান জানাই সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাবার জন্য। শ্রেণী সমস্যার সম্পূর্ণ ও চিরতরে অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের নেতাজীর স্বপ্নকে সফল করতে হবে।

ভারতে নেতাজীর আদর্শে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হোক—আজকের দিনে এই আমাদের কাম্য। নেতাজীর জীবনের মূল স্বপ্নকে সার্থক করে তোলাই আমাদের, ভারতবাসীদের আজকের সবচেয়ে বড় কাজ।

২৩জানুয়ারি, ১৯৬৪।
নেতাজি জন্মোৎসব স্মারকগ্রন্থ।

চাই একটি সাধারণ মঞ্চ

সতীর্থ প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কমরেডরা,

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নবম জাতীয় সম্মেলনের সূত্রে আমরা এই চমৎকার মন্দির-নগরীতে মিলিত হয়েছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে এবং আগামী দিনের জন্য আমাদের কর্মসূচি ঠিক করতেই এই সম্মেলন। এক অত্যন্ত সঙ্কট কালের মধ্যে আমাদের এই আলোচনা এবং আমি নিশ্চিত, জাতিকে সমাজতন্ত্রের পথ দেখাতে আপনারা সক্ষম হবেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের এই নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে পার্টির সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের ইতিহাসের এই ঘটনাবহুল পঁচিশ বছরে ফরওয়ার্ড ব্লক তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার অভিযানকে সফল করতে সে দৃঢ়-সংকল্প।

এই শহরে এসে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ইউ এম থেবরের স্মৃতিতে। কয়েক বছর আগে প্রয়াত থেবর শুধুমাত্র মাদুরাই অথবা রামাবাদ-এর নেতাই ছিলেন না, তিনি সারা ভারতের যশস্বী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের বাইরেও তাঁর অনেক অনুরাগী আছেন। তিনি ছিলেন নেতাজীর আত্মদানসর্বস্ব অনুগামী। জনগণের বিশ্বস্ত নেতা। তাঁর অকালমৃত্যুতে ফরওয়ার্ড ব্লক তার বলিষ্ঠতম একটি স্তম্ভকে হারিয়েছে। থেবরজির স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমার আশা, তাঁর জীবন ও চিন্তা জনসাধারণের জন্য কাজ করায় প্রেরণা যোগাবে।

কমরেড, আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে বিরাট দায়িত্ব। স্বাধীনতা প্রপ্তির আঠেরো বছর পরেও দেশের সাধারণ মানুষ আজ খাদ্য পায় না, তাদের আশ্রয় নেই, শিক্ষা নেই। সর্বগ্রাসী সঙ্কট প্রতিদিনই গভীরতর হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং উর্দ্ধহারের করের চাপে মানুষ নাজেহাল। নেতাজীর আদর্শের বন্ধনে যাঁরা রয়েছেন, শ্রমজীবী মানুষের জন্য যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অত্যন্ত গভীর ভাবেই আজ এই পরিস্থিতির কথা ভাবতে হবে এবং লড়াইয়ের কর্মসূচি তৈরি করতে হবে, যার সাহায্যে আমরা এই ভয়ঙ্কর চক্রের অবসান ঘটাতে পারব এবং এর জন্য আমাদের পার্টির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং পার্টি সংগঠন নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী কয়েক দিনে আপনারা যথেষ্ট সময় পাবেন। আমি শুধু এই মুহূর্তে আমাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

উত্তর ভিয়েতনা মে ফের বোমা নিক্ষেপের যে সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। গত বড় দিনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সামরিক ভাবেই বোমা নিক্ষেপ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিল তখন কিছু লোক আশা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনা যাবে এবং ভিয়েতনাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনার টেবিলে বসানো যাবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির পথ থে কে সরে আসবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগীদের মনে রাখা দরকার, ভিয়েত কং মুক্তি যোদ্ধাদের তারা কোনদিনই ধ্বংস করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে যাঁরা কয়েক বছর ধরে লড়াই চালিয়ে প্রতিটি জায়গায় যাচ্ছেন সেই সব সাহসী মানুষের পেছনে আছেন স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভিয়েতনাম থেকে তার বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার এবং সেদেশের মানুষের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়ার এটাই হল উপযুক্ত সময়। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তিকে সরাসরি নিন্দা করার সাহস ভারত সরকার দেখাতে পারেনি, এ ঘটনা গভীর দুঃখের। আমি আশা করব, আমাদের সরকার তার পথ পাল্টাবে এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

রোডেশিয়ার সমস্যাও রয়েছে। আয়ান স্মিথের একতরফা ভাবে রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে গোটা আফ্রিকা, সারা পৃথিবী। কিন্তু আয়ান স্মিথের বর্ণবাদী সংখ্যালঘু সরকার দেশের প্রশাসনে কৃষ্ণাঙ্গদের অংশগ্রহণ অস্বীকারে ওই ঘোষণা করতে দৃঢ়- প্রতিজ্ঞ এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই ব্রিটিশ সরকার এক্ষেত্রে কিছু করতে নারাজ। রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত, আফ্রিকা মহাদেশের মানুষের ইচ্ছার কথা তারা শোনে নি। আয়ান স্মিথের ভেঙে যাওয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের

ব্যাপারে কমনওয়েলথ এবং রাষ্ট্র সংঘের পররামর্শে তারা কান দেয় নি। যুক্তরাজ্যের এখন বোঝা উচিত যে অর্থনৈতিক শাস্তি যথেষ্ট নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে, এক্ষেত্রেও তা ব্যর্থ হবে। রোডেশিয়ার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ ব্রিটিশ সরকারকে সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। যদি তারা তা না করে তাহলে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরাই নিজেদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। আর আমরা এই কাজে তাদের সঙ্গে থাকব। এই ঘটনায় তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে আমাদের সরকারকে।

আমরা চাই শান্তি। শান্তির যে কোনও প্রয়াসকে আমরা সমর্থন জানাব। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও পরিষ্কার করে বলা দরকার যে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই চলবে আমাদের নিরন্তর যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের শেষ ধ্বংসাবশেষটুকুও আমাদের সরিয়ে ফেলতে হবে।

জাতীয় পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখব আমরা এখন বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সমস্যার মুখোমুখি। একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের চোদ্দ হাজার বর্গমাইল এখনও চীনাদের দখলে। দীর্ঘ সময় ধরে দখল করে রাখা অন্যের জমি ছেড়ে চলে যাবার কোনও ইচ্ছাই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। সীমান্তের অন্য পারে দাঁড়িয়ে আছে চীনা সৈন্য, প্রতিদিনই যখন তখন তারা সীমান্ত লঙ্ঘন করছে। চীনের এই বৈরীমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা চীনের সঙ্গে সমস্ত রকম বিরোধেরই শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি চাই, কিন্তু আমাদের ভূখন্ড হারিয়ে কোনরকম সমাধানে যাওয়ার আমরা বিরোধী।

কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেয় যে দেশ, তারা ভারতের মতো বন্ধু মনোভাবাপন্ন একটি দেশকেআক্রমণ করতে পারে, এঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। কমিউনিজমের পথ থেকে চীন বিচ্যুত হয়েছে এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের নীতি নিয়েছে।

নেতাজীর যাঁরা অনুগামী তাঁদের কাছে জাতির স্বার্থ সবার আগে। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্নকে আমরা গুরুত্ব দেব সবার আগে।

১৯৬২ সালে চীনের এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের আক্রমণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এদেশের মানুষ তাদের শেষ রক্তবিন্দুও দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রশাসনের মাথায় যে সব কর্তারা বসে আছেন তাঁরা এই দুই আক্রমণের প্রতিরোধে জনগণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম দেখা গিয়েছিল তাকে প্রকৃত কার্যকরী প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। বরং ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে এবং ফয়দা তোলার জন্য তাঁরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছেন।

গত আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানি সেনাকে পাল্টা আঘাতের সময় আমাদের সাহসী জওয়ানরা বীরের পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের চাপের কাছে ভারত নতিস্বীকার করবে না, বরং আক্রমণকে প্রতিহত করবে, এই সিদ্ধান্ত যখন আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী নিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন গোটা জাতিকেই। পাকিস্তান সেই সময়ে আমাদের শক্তি ও সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়েছিল, সেই শক্তিই হটিয়ে দিয়েছিল তাদের।

পাকিস্তানের বিগত আক্রমণ প্রমাণ করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য কেউই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সময় তারা পাকিস্তানের পক্ষই নিয়েছে। এই দুই দেশ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সময় এসেছে। আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি, কমনওয়েলথ থেকে ভারত বেরিয়ে আসুক, কারণ কমনওয়েলথ হল আসলে যুক্তরাজ্যের স্বার্থরক্ষা করার জন্য একটা গোঁজামিল সংগঠন। ভারতের প্রতি যুক্তরাজ্যের সম্প্রতি অমৈত্রীসুলভ ব্যবহার আমাদের এই সিদ্ধান্তের যথার্থ্য প্রমাণ করে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে আমরা বিক্ষোভ শুরু করব।

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের উপস্থিতিতে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান একটি চুক্তিতে সই করেছেন। তাসখন্দ ঘোষণা হিসাবে চিহ্নিত এই বিখ্যাত চুক্তির উদ্দেশ্য হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা সমস্তরকম বিরোধেরই নিষ্পত্তির পক্ষে। ভারতের মতো দেশ প্রতিরক্ষার জন্য রাশি রাশি অর্থ খরচ করতে পারে না। সেই কারণেই আমাদের সব থেকে কাছের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আমরা চলব। আমরা জানি, ভারতের প্রতি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক মনোভাব নেই। ভারত বিদ্বেষী ঘৃণাকে সম্বল করে যারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেই ধরনের কিছু মানুষ মাঝে মধ্যে আমাদের ওপর সংঘর্ষ চাপিয়ে দেয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পথ করে দিয়েছে তাসখন্দ ঘোষণা, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখতে হচ্ছে যে ভারতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের শাসকরা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা না গলানোর শর্তে রাজি হলেও তাঁরা কাশ্মীরকে ভারতের অভ্যান্তরীণ বিষয় বলে মনে করেন না। সেই কারণে কাশ্মীর নিয়ে মাথা গলালে তা কখনই তাসখন্দ ঘোষণাকে লঙঘন বলে গণ্য করা যাবে না। ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকের জন্য যে আলোচ্যসূচি পাকিস্তান সরকার প্রস্তাব হিসাবে রেখেছে তার এক

নম্বরেই আছে কাশ্মীর এবং সেই আলোচ্যসূচিতে 'ভারত থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার'-কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তারা জানিয়েছে। শোনাই যাচ্ছে, ভারতের প্রতি পাকিস্তান তার মনোভাব পাল্টায়নি। তাহলে কেন আমরা হাজি পীর, তিথওয়াল এবং কারগিল থেকে আমাদের সেনা প্রত্যাহার করব এবং ভবিষ্যতে ফের পাক-আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত করব?

তাসখন্দে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে সরকার যে রাজি হয়েছিলেন, এটা খুব ভাল লক্ষণ নয়। সম্ভবত বাইরের প্রচন্ড চাপ ছিল সরকারের ওপর। কাশ্মীরের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা তা থেকে সরে আসা চলবে না। কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত। এ নিয়ে আর কোনও কথা তোলা যাবে না। সরকার যদি কাশ্মীর প্রশ্নে দোলাচল হয় তাহলে দেশের মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি এখন মারাত্মক। লক্ষ লক্ষ মানুষের আজ খাদ্যের সংস্থান নেই, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসছে অনাহারে মৃত্যুর খবর। কেরলের সাম্প্রতিক ঘটনাই বুঝিয়ে দিয়েছে হাওয়া এখন কোন দিকে। সর্বত্রই মানুষ এখন মরিয়া। গোটা দেশ হয়ে উঠেছে অগ্নেয়গিরি, যে কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। স্বাধীনতার পর গত আঠেরো বছরে অধিক খাদ্য উৎপাদনে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, বিশেষত খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরতাই আজ আমাদের এই পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছে। খাদ্যের কালোবাজারি-মজুদদারি রুখতে সরকারের ব্যর্থতা এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার ক্ষেত্রে তাদের উদাসীনতা পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক করেছে।

সরকার যদি দেশকে সত্যিই খাদ্যে স্বয়ম্ভর করতে চায় তাহলে তাদের ভূমি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে, ভূমিহীনদের দিতে হবে জমি, সর্বত্র জলের ব্যবস্থা করতে হবে, সার উৎপাদন বাড়াতে হবে, কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার চালু করতে হবে, সমবায়ে চাষের পদ্ধতি চালু করত্রে হবে এবং দরিদ্র কৃষকদের সময়মতো সহজ ঋন দিতে হবে। উৎপাদন যদি সত্যি সত্যিই বাড়াতে হয় তাহলে এই কাজগুলি হল তার নূন্যতম শর্ত। আমরা যদি আন্তরিকভাবে কাজ করি তাহলে এখনকার তুলনায় কয়েকগুণ উৎপাদন বাড়ানো মোটেই কষ্টকর কিছু নয়।

কিন্তু বর্তমান সঙ্কটের কী হবে? আমার প্রস্তাব, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সর্বদলীয় উদ্যোগ নেওয়া হোক। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সর্বস্তরে সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হোক কমিটি। এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হোক

এবং এক্ষেত্রে কোনও রকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব রাখা চলবে না। যেসব রাজ্যে খাদ্য উদ্বৃত্ত তারা সাহায্য করবে খাদ্যে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হবে অনেক বেশি। দেশ জুড়ে সার্বিক ভাবে চালু করতে হবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে। সরকার যদি এই দাবিগুলি মেনে না নেন তাহলে সরকারের জনবিরোধী খাদ্যনীতির প্রতিবাদ এবং সকলের জন্য খাদ্যের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। এর জন্য আমাদের যে কোনও মূল্যের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত চেহারা নেয়নি। গত তিনটি পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক নয়। এই পরিকল্পনাগুলি, যদি কিছু করে থাকে, তাহলে তা বড়লোক দের পকেটকেই শুধু ভর্তি করেছে। দেশের মূল সমস্যাগুলির কোনও সমাধান হয়নি। এই পরিকল্পনাগুলি যতদিন খাদ্য, বাসস্থান এবং শিক্ষার সমস্যা মেটাতে না পারছে ততদিন সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে না।

১৯৬২ সালের চীনের আক্রমণের ঠিক পরেই ভারতের রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সংসদ পরে তা অনুমোদন করে। ভারত রক্ষা আইনও গৃহীত হয়েছে এবং তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য যে কোনও ক্ষমতা আমরা সরকারের হাতে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের প্রকৃত শত্রু যারা তাদের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা আইন কার্যকর না করে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে খর্ব করার জন্য। ভারত রক্ষা আইনে কারান্তরালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলের সদস্যদের। ক্ষমতার এই অপব্যবহার দেখে মানুষকে আজ ভাবতে হচ্ছে, শাসকবর্গকে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে আর তারা দেবে কি না।

আমরা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই, কোনও ভাষাকেই অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সংবিধানে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হিন্দিকে দেশের কোনও অংশেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের অগ্রিম অনুমোদন ছাড়া চালু করা যাবে না। হিন্দিকে যদি সর্বভারতীয় ভাষায় উন্নীত করতে হয় তাহলে অন্যান্য ভাষা থেকেও হিন্দিকে অনেক শব্দ নিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত অহিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকেরা ইংরাজিকে বাদ দিতে রাজি না হবে ততদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় কাজের জন্য হিন্দির পাশাপাশি ইংরাজিকে চালু রাখতে হবে। রাজ্যস্তরে সমস্ত সরকারি কাজ হবে আঞ্চলিক ভাষায়। সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত রকম নির্দেশেরই মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

কোনও কোনও সময় আমরা দেখেছি, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত স্বার্থ বড় হয়ে যায়। আমাদের জাতির সব থেকে বড় শত্রু যে সাম্প্রদায়িকতা তা এখনও সজীব। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে কোনও মূল্যে আমাদের লড়তে হবে এবং সব কিছুর উর্দ্ধে রাখতে হবে জাতির স্বার্থকে। দেশের সংহতিকে নষ্ট করার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে চূড়ান্তভাবে। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা একবার দেশবিভাগ দেখেছি, দ্বিতীয়বার তা দেখতে আমরা রাজি নই। আমার মনে হয়, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে, জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য তা দূর করা উচিত এবং যুগ যুগ ধরে যে অঞ্চলগুলি অনুন্নত হয়ে আছে সেগুলির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিছুদিন ধরেই আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি এমন আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নেতাজী মারা গেছেন, এটা প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত সরকার, কেন কে জানে। কিন্তু দেশের মানুষ শাহ নওয়াজ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মানতে নারাজ। কারণ তারা নিশ্চিত যে গোটা ঘটনার পেছনেই একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে। তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদপত্রে নতুন কিছু খবর প্রকাশিত হওয়ায় নেতাজী সম্পর্কে আবার নতুন তদন্তের অপ্রতিরোধ্য দাবি উঠেছে। আমি ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাব, এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীনে একটি কমিটি গঠন করা হোক।

ফরওয়ার্ড ব্লক একটি মার্কসবাদী পার্টি। ফরওয়ার্ড ব্লক বিপ্লবী কর্মসূচিতে আস্থাশীল। সমাজতন্ত্র চাড়া আমাদের জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয় এবং সমাজতন্ত্র কখনই শান্তিপূর্ণ উপায়ে, বিবর্তনের পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর জন্য দরকার শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী উত্থান। আপনাদের দয়িত্ব হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করা এবং শ্রমিক, কৃষক, গরিব-মধ্যবিত্ত এবং বঞ্চিত জনগণের অন্যান্য অংশের কাছে তা উপস্থিত করা।

কমরেড, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এসে গেছে। বিপ্লবী কর্মসূচিতে আস্থাশীল হলেও আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি কারণ আমাদের সংগঠনকে সম্প্রসারিত করা এবং জনসাধারণের ক্ষোভকে আইনসভায় তুলে ধরার পক্ষে এটা একটা ভাল সুযোগ। সারা দেশের মানুষই আজ কংগ্রেসি অপশাসনে ক্লান্ত এবং বিরক্ত। কংগ্রেস আজ পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক এবং সমস্ত রকম সুবিধাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধীর নির্বাচন এবং নতুন ক্যাবিনেট গঠন আবার প্রমাণ করেছে, কংগ্রেস এবং সরকারের ওপর বৃহৎ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ কতটা জোরাল। কংগ্রেসের কাছে আমাদের প্রত্যাশার আর কিছুই নেই। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে। এটা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে নিয়ে আমাদের একটি সাধারণ মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের পার্টির বৃহৎ ভবিষ্যৎ আছে। ভারতের মানুষের কাছেই আশ্চর্য্য আবেদন আছে নেতাজীর আদর্শের। সঠিকভাবে যদি আমরা পার্টিকে সংগঠিত করতে পারি তাহলে তা সাধারণ মানুষের কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। কমরেড, কাজে নামুন, আগামী দিন আপনাদেরই।

শেষ করার আগে, যাঁরা গত কয়েক বছর ধরে চেয়ারম্যান পদে কাজ করার সময় আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নবম
অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।
মাদুরাই। ১৮ থেকে ২০ মে, ১৯৬৬।

আগস্ট বিপ্লব

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আগস্ট বিপ্লবের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দিন থেকে দেশবাসী বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে নানা আন্দোলন করেছে, আর তার ফলে ইংরেজ এ দেশ থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব।

৯ই আগস্ট, ১৯৪২ দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল এক প্রচন্ড বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। কংগ্রেসের নেতৃত্ব সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন মাত্র। প্রায়োজনীয় নির্দেশ দান বা আন্দোলন পরিচালনার সুযোগ তাঁদের ঘটে নি। কংগ্রেস তথা প্রায় সকল বামপন্থী দলের ছোট-বড় নেতা ও কর্মীকে ইংরেজ সরকার আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। খুব সামান্য ক'জন বাইরে থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা নিজেরাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন। "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো", আর "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী জনতা রেল লাইন উপড়েছে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে, থানা দখল করেছে। ইংরেজ শাসনের চিহ্ন নির্মূল করে তারা সাতারা, বালিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বহু জায়গায় স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। পুলিশ ও সৈন্যদলের বর্বর, নির্মম ও অকথ্য নির্যাতন উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ সেদিন অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছে। সে বীরত্বের তুলনা মেলা ভার।

আগস্ট বিপ্লবের শহীদ সিন্ধুর ছাত্র হিমু কালানি কিংবা তমলুকের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার কাহিনী আজ লোকগাথায় পরিণত হয়েছে। কলকাতার রাজপথে তরুণেরাও সেদিন কম লড়াই করেনি। সারা ভারতে আগস্ট বিপ্লবে অর্ধ লক্ষ মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

ইংরেজের চরম নির্যাতন ও এক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিয়াল্লিশের এই বিপ্লব পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। যদি বিলম্ব না করে ঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত, উপযুক্ত প্রস্তুতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হত এবং সংগঠিত নেতৃত্ব থাকত, তবে আগস্ট বিপ্লবের চেহারা অন্যরকম হত, দেশের ইতিহাস আজ ভিন্ন ভাবে লিখতে হত।

তবুও আগস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হয় নি। স্বাধীনতার জন্য দেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্খা কত প্রবল, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা কত তীব্র এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের মৃত্যুপণ কত কঠিন, তার প্রমাণ ইংরেজ শাসকরা এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পেয়েছে। ইংরেজ বুঝেছে, তাদের দিন শেষ হয়েছে। এর পর নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই শেষ আঘাত হেনেছে ইংরেজ শাসনের ওপর। আগস্টবিপ্লব বিদ্রোহ জাগিয়েছে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ, নর-নারী, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবকের মধ্যে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী সকলের প্রাণে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও. আজাদ হিন্দের অবদান বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ভেতর। ইংরাজ শাসকের একান্ত অনুগত এই আরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকেদের আনুগত্য শিথিল করে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে আজাদ হিন্দের লড়াই-এর ফলে। নাগপুর ও বিহারের পুলিশ বিদ্রোহ এবং বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৪৫-এ যুদ্ধশেষে ভারতে যে বিরাট গণজাগরণ দেখা দেয়—ছাত্রদের সংগ্রাম, কৃষক ও শ্রমিকের লড়াই, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও অন্যান্য কর্মচারী আন্দোলন, পুলিশ ও সৈন্যের বিদ্রোহ, এ সবের মূলে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আগস্ট বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেরণা।

তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শেষ পর্যায়ে যে সব ঘটনার প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, আগষ্ট বিপ্লব তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।

এই প্রসঙ্গে আগস্ট বিপ্লব তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল্যায়নকালে দু'টি প্রশ্নের বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথম, ভারতের স্বাধীনতা কি আপসের পথে এসেছে? ১৯২৮-১৯৪০, এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে দুই মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রকে উপলক্ষ করে এই প্রশ্ন উঠেছিল : কোন্ পথে স্বাধীনতা—আপসের পথে না সংগ্রামের পথে? সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন, সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বিশ্ব জুড়ে এক বিরাট যুদ্ধ আসছে। এই সময় ইংরেজ বিব্রত থাকবে, সুতরাং ইংরেজকে ভারত ত্যাগের জন্য 'চরমপত্র' দিয়ে

তাদের বিরুদ্ধে সরা দেশে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করা হোক, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব। গান্ধীজী এই পথ অনুমোদন করেননি। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এসে ভিন্ন দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করতে হয়েছিল। সকল বামপন্থীকে এক করে তিনি দেশব্যাপী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু শিগগিরই তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখে। পরে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে দেশত্যাগ করেন ও বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এ সব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে যে তীব্র বিক্ষোভ জেগেছে, সংগ্রামের জন্য অদম্য মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, গান্ধীজী বা কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাই, বোম্বাই শহরে গোয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ ইংরেজকে ভারত ত্যাগের নোটিশ দিয়ে দেশবাসীর প্রতি সংগ্রামের যে আহ্বান জানানো হয়, তা এই বামপন্থী আপসবিরোধী কর্মপন্থারই জয়। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইংরেজ প্রস্তুত হবার সময় পেয়েছে। ১৯৪২-এ শুরু না করে যদি সুভাষচন্দ্রের কথামতো ১৯৩৯ বা ১৯৪০-এ এই সংগ্রামের ডাক দেওয়া যেত, তবে তার চেহারা অন্য রকম হত। যাইহোক, আগস্ট বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন আপসের পথে চুক্তি করে হয়নি, আপসবিরোধী সংগ্রামের জোরেই হয়েছে। যুদ্ধের পর ক্যাবিনেট মিশন, মাউন্টব্যাটেন মিশন প্রভৃতির সঙ্গে যে আপস আলোচনা, তাও সম্ভব হয়েছে এই সংগ্রামের চাপে। আর, জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ বর্জন করে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যায়ে এই আপসের পথে গিয়েছিলেন বলেই ভারত খন্ডিত হয়েছে এবং নানাভাবে আমাদের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। যেটুকু স্বাধীনতা আজ এসেছে, তা সংগ্রামের জন্য, যেটুকু অসম্পূর্ণ তা আপসের জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ভারতের স্বাধীনতা কি অহিংসার পথে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসেছে? ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত ঝরেছে যে তার পরও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এই দুঃখ। তবু এক দল ইতিহাসবিদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণের চেষ্টা করছেন যে অহিংস পদ্ধতিতে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে।

মহাবিদ্রোহে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা কামান-বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, থেকে শুরু করে শত সহস্র শহিদ বোমা, পিস্তলের পথে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন। দেশব্যাপী গণজাগরণের মূলে এই বিপ্লবীদের অবদান অসামান্য।

আগস্ট বিপ্লব সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে পরিচালনার ইচ্ছা ছিল মহাত্মা গান্ধীর। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। বিপ্লব প্রচন্ড হিংসাত্মক পথে অগ্রসর হয়েছে। বিদ্রোহী জনতা কোনও কিছুই বাদ দেয় নি। বলতে গেলে, স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জনসাধারণ সঙঘবদ্ধভাবে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে। নিজেরা জোর করে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র দখল করেছে। জেলে বসে গান্ধীজি ক্ষোভে গুমরে মরেছেন, বাইরে তাঁর অনুগামীরা এর বিরোধিতা করেছেন, তা সত্ত্বেও বিপ্লবের গতি রোধ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে নেতৃবৃন্দ এই হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করেছেন। তবু আগস্ট বিপ্লব তার সব ঘটনা নিয়েই মহান।

আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইও অহিংস নয়। তারপর যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের কালে যে-সব সংগ্রাম হয়েছে তাও অহিংসাভিত্তিক ছিল না। দেশবাসী অস্ত্রধারণ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই ইংরেজকে এ দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। বিনা রক্তপাতে অহিংসপন্থায় স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি। শেষ পর্যায়ে দক্ষিণপন্থী নেতারা যে আপস প্রয়াস করেছেন, স্বাধীনতা তার ফলে আসেনি, বরং এর জন্য স্বাধীনতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যার জের আমরা আজও ভোগ করছি।

আগস্ট বিপ্লবের মূল্যায়নে তাই আমরা এই সত্যে উপনীত হই, ভারতবাসীর আপসহীন ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে।

১৯৬৭।

আগস্ট বিপ্লব রজত জয়ন্তী স্মারক-গ্রন্থ

জয়তু নেতাজী

নেতাজীর পুণ্য জন্মলগ্নের স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় উৎসব বার্ষিকীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে আজ শুধু নেতাজী প্রশস্তি গেয়ে দায়মুক্ত হবার জো নেই। জো নেই এ কারণে যে, গত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে এক মৌলিক পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নেতাজীর মুহুর্মুহু হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে, দেশের তথাকথিত বামপন্থীগণ যে কলঙ্কজনক আচরণ করেছিলেন—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ভারতীয় বশম্বদদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিতে, কংগ্রেসের গান্ধী মার্কা নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরণে সক্রিয় সহায়তা করে তাঁরা দেশের কোটি কোটি দরিদ্র জনতার প্রতি যে ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, —সে বিশ্বাসঘাতকতা গত ২০ বছর ধরে তিলে তিলে ক্রমবর্দ্ধিত হয়ে আজ তার চূড়ান্ত বিভৎস রূপ ধারণ করেছে।

কংগ্রেসী স্বাধীনতা সম্পর্কে মোহমুক্ত দেশবাসীর বিকল্প পথে পদক্ষেপ প্রচেষ্টার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে আজ কংগ্রেসী দুষমণেরা। বিদেশি অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পোষা বিজাতীয় কুকুরের দল আজ তাদের সক্রিয় সহযোগী। তথাকথিত গণতন্ত্রের ফানুস পার্লামেন্ট ও আইন সভার ঘোমটা আজ অপসারিত। দানবের দল নরক গুলজার করে বসে ক্ষমতার স্পর্দ্ধা প্রদর্শণ করে, শোষিত জনতার মস্তক লক্ষ্য করে খড়্গ হেনে চলেছে—কাঁদুনে গ্যাসের ধুম্রজালের আবর্তে লাঠি ও গুলির একনায়কত্ব কায়েম করেছে। জাতীয় নীতি বা আদর্শের কোনও বালাই ওদের নেই। লোভ, জিঘাংসা ও লুণ্ঠন বৃত্তির অবাধ প্রতিযোগিতাই ওদের কাছে পবিত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আমেরিকার, ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনীতিই ওদের রাষ্ট্রনীতি—তাদের অঙ্গুলি হেলনেই ওরা ওঠ-বস করে।

আজ থেকে ২৭ বছর পূর্বে দেশের বুকে লুক্কায়িত এই শয়তানদের দেখতে পেয়েছিলেন শুধু একজন—তিনি নেতাজী। নেতাজী বলেছিলেন, 'ওদের হাতে দেশের ক্ষমতা গেলে ওরা দেশকে নর্দমায় নামিয়ে দিয়ে, বিদেশি লুঠেরাদের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করবে'। ঘটেছেও তাই এবং তাও প্রতিটি অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

তাই তো বলছি, নেতাজী জন্মোৎসবকে শুধুমাত্র নেতাজী স্মরণে সীমায়িত করে রাখার দিন আজ ফুরিয়েছে। নেতাজী জন্মোৎসবকে দেশপ্রেমের পুনর্জন্মোৎসবে রূপান্তরিত করাই আজকের দিনের পবিত্রতম কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত—অগ্নির মতো পবিত্র ও আপসহীন বিপ্লব-বহ্নির লেলিহান শিখা স্বরূপ, পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দধিচি-পুরুষ-প্রবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজও বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে ধ্রুবতারার মতো প্রতিনিয়ত জ্বলজ্বল করে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। শোষিত, পদদলিত ও জর্জরিত মানবাত্মার মুক্তিপথের নিশানা হিসাবে তা দেশপ্রেমিকদের জোগাবে অমিত শক্তি, বিদেশি 'অর্থ' ও 'নীতি' পুষ্ট শয়তানদের প্রতি জোগাবে অগণিত দেশপ্রমিকের অন্তরের নিকৃষ্টতম ঘৃণা, জিঘাংসা ও পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের অভিশাপ। জয় হিন্দ্। নেতাজী জিন্দাবাদ।

২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
নেতাজী জন্মোৎসব স্মারক-গ্রন্থ।

সমাজতান্ত্রিক নেতাজী

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শবাদ রূপায়ণের জন্য দেশবাসী শপথ গ্রহণ করে। পৃথিবীর মধ্যে কোনও মহানায়কের জন্মতিথিই এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয় না। অন্যান্য নেতাদের জয়ন্তী সরকারিভাবে বা তাঁর গুণমুগ্ধদের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু নেতাজী জয়ন্তী দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিক সোৎসাহে উদ্‌যাপিত করে।

নেতাজী জয়ন্তী উদযাপনের সময় কেবল এ-কথাই মনে হয়, দেশবাসী নেতাজীর আদর্শবাদ কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে? আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় উদ্‌যাপন এক জিনিস আর জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর মহান আদর্শ রূপায়ণ আর এক জিনিস।

নেতাজী ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন—১৯৪৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে নেতাজী দেশভাগের সর্বনাশা। ব্রিটিশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেছিলেন। ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতৃত্বে ইতিহাসের লিখন বুঝতে পারেনি। ফলে আজ সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষ আরও অধিক পরিমাণে শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। নেতাজী ছিলেন অপরিসীম দূরদর্শিতা সম্পন্ন জননায়ক। একদিকে তিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্যের প্রতীক, অপরদিকে তাঁর সমস্ত জীবন কাহিনীই রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর।

আত্মত্যাগ, নির্লোভ, কৃচ্ছ্র সাধনা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, দুর্জয় সাহস ও চরম অন্তর্দৃষ্টির বলে নেতাজী যে জীবন আলেখ্য রচনা করেছেন তা পৃথিবীর মুক্তিকামী ও

সমাজতান্ত্রিক মানুষের নিকট অনন্তকালের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (১) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ, (২) স্বাধীনোত্তর যুগে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা, (৩) দেশের ভাষা সমস্যা, (৪) খাদ্যসমস্যা, (৫) দেশরক্ষা সমস্যা, (৬) তৃতীয় আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ ব্লক গঠন, (৭) সমাজবাদী পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্বাণী সরকার ও দেশবাসী গ্রহণ করলে খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২১ বৎসর পর দেশের আজ চরম অধোগতি হত না এবং অর্থনেতিক দিক দিয়ে সম্পদশালী ভারতবাসী এত পশ্চাৎগামী হত না।

নেতাজী ১৯৩৮ সালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'ভারত ছাড়ো' এই চরমপত্র দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড তখনও আপস করতে ব্যগ্র ছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও তখন সকল রকম গণ-আন্দোলনের পথ পরিহার করেছিল। পরিশেষে ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতৃত্ব 'ভারত ছাড়ো' এই সমর ধ্বনিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে পুঁজিবাদ এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে তাদের পক্ষে ১৯৪৬ সালে আর একবার বিপ্লবের আহ্বান জানানো সম্ভব হয়নি। নেতাজী এসব ঘটনাবলী জানতেন। ১৯৪০ সালে যখন বামপন্থী ঐক্য গড়তে নেতাজী ব্যর্থ মনোরথ হলেন, যখন সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি কথা দিয়েও বৈপ্লবিক সংগ্রামে পিছিয়ে রইল এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদ-পুষ্ট মুসলিম লিগ দেশের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য গাটছড়া বাঁধতে চলল তখন নেতাজী বুঝেছিলেন বাইরের সশস্ত্র অভিযান ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে না। ইতিহাস পুরুষ নেতাজীর আজাদ হিন্দ সংগ্রামের সঙ্গে যদি দেশের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম শক্তিশালী হত তাহলে দেশের ধনিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হত না।

নেতাজী বলেছেন—'By Freedom I mean allround freedom for the individual as well as for Society and for all classes. This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequalities and destruction of communialism and religious intolerance.' কাজেই নেতাজীর সমাজবাদী দৃষ্টি ভঙ্গী নতুন কথা নয়।

ভারতের আর একজন মহাপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নেতাজীকে 'দেশনায়ক' আখ্যা দিয়েছিলেন মহাজাতি সদনের উদ্বোধনী ভাষণে। কবিগুরু বলেছিলেন, 'After a lapse of many years I am addressing this meeting. My days have come to an end. I may not join him on the fight that is to come. I can only bless him and take my leave, knowing that he has made his country's burden of sorrow his own, that his final

reward is fast coming as his country's freedom.' নেতাজীর আদর্শবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সার্থক ও অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে। এর সঙ্গে বিপ্লববাদ ও নেতাজীর গতিশীল সংগ্রামী নেতৃত্ব যুক্ত হয়ে যে আদর্শবাদ গড়ে উঠেছে তাই হবে আগামীকালের ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ।

২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
নেতাজী জন্মজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, লোকমত প্রকাশনী।

বাইশে জুনের আহ্বান

আজ ২২শে জুন। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৪০ সালের এই দিবসেই নাগপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি 'দল' হিসেবে ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা আন্তর্জাতিক চক্রের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হয় নি। বিশ্বের পরাধীন দেশসমূহের মধ্যে বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদে-বিরোধী সংগ্রামী জনগণের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও বিপ্লবী নেতৃত্ব রূপেই ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছিল—ঠিক যেমন, ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই স্বাধীন দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশ্বস্ত নেতৃত্ব স্বরূপ সংগঠিত হয়েছিল 'বলশেভিক পার্টি'।

বলশেভিক পার্টির সফলতায় গর্বিত নেতৃত্বের, মার্কসবাদের একচেটিয়া ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় আসীন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের, বিশ্বের পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় সংগ্রামে, ভুল নেতৃত্ব প্রদান ও চক্রান্তমূলক মার্কসীয় বিজ্ঞান-বিরোধী আচরণই, বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্রকে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ভারতের জাতীয় গণমুক্তি সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতার সহযোগিতায় দেশের তথাকথিত বামপন্থীদল ও নেতাদের আন্তরিকতায় উদ্বিগ্ন হয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গণবিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সকল বামপন্থীদের মিলন চক্র স্বরূপ সংগঠিত মূল ফরওয়ার্ড ব্লকের রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে একটি সু-সংগঠিত 'দল' রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে

সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে—

"The Left-Consolidation Committee which came into existence in June 1939, after the formation of the Forward Bloc, has disintigrated by now. Royists (or Radical Leaguers), the Congress Socialists and the Communists (or National Fronters) have in turn deserted the Left-Consolidation Committee and only the Kissan Sabha and the Forward Bloc have been functioning as the spear-head of the Left-Movement in this country. This was evident when we held the All India Anti Compromise Conference at Ramgarh in March 1940. There we found that the Royists, Congress Social-ist s and National Fronters boycotted that Conference and threw in their lot with the Gandhiites.

"There can be little doubt today that if there had been no Forward Bloc and no Kissan Sabha, no voice would have been raised against the Policy and line of action pursued by Gandhiites during the last twelve months.

.........."In any case, I appeal to you not to leave Nagpur till you have in your pockets a concrete plan of action for wining Purna Swaraj in the immediate future.

"Let us proclaim once again--All Power to the Indian people, here & now."

উপরোক্ত উদ্বৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, সুভাষচন্দ্র তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের তৎকালীন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে, দেশের ওই সকল বামপন্থী দল সমূহের ব্যর্থতাই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় জীবনে কংগ্রেসী শাসনের মারফৎ অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও অভিশাপের করাল ছায়া ডেকে এনেছে। জাতীয় জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা থেকেই আজ সমগ্র দেশবাসী ও তথাকথিত গণবিপ্লবীদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশের সকল বামপন্থীদের কাছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রীয় শক্তিতে ভারতীয় জনগণের ক্ষমতা কবুল করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ভিন্ন অপর কোন রূপ পরিগ্রহ করেনি। অথচ তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী

দল ও নেতাগণ এবং কমিউনিস্ট চক্রের সুভাষচন্দ্রের ওই আপসহীন প্রত্যক্ষ বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও দুঃসাহস প্রকাশে চরম ব্যর্থতা ও অসহায়তাই প্রদর্শন করেছে। অবশ্য, পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্বের ব্যাপারে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কবুল করার আন্তর্জাতিক ফরমানের প্রভাবে তখনও বিশ্বের কমিউনিস্টগণ মোহগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ, কমিউনিস্টদের মতে শ্রমিক শ্রেণীর একচেটিয়া নেতৃত্ব (অর্থাৎ কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব) ভিন্ন কোনও পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি অর্জন নাকি সম্ভব নয়, এই ছিল তাদের নীতি। এবং যেহেতু, সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্ট দলভুক্ত ছিলেন না, সেহেতু তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবের আহ্বান সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বিশ্বাসও ছিল না। আজ অবশ্য কমিউনিস্টদের স্কন্ধে আর ওই ধরনের মার্কসীয় মার্কা দেওয়া স্বকপোলকল্পিত নীতিগত ভূতের অবশিষ্ট নেই। কারণ ইতিমধ্যে বিশ্ব ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, কমিউনিস্টদের ওই নীতি ছিল মূলত ভ্রান্ত এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে ইন্দোনেশিয়া, কিউবা এবং আফ্রিকার বহুদেশের সফল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে তারকার মতো দ্যুতি বিকিরণ করছে। শুধু তাই নয়, এমন কি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পীঠভূমি সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি মুখপত্র 'প্রাভদা' কিছু দিন আগে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতা বলে পরিচিত মাও-ৎসে-তুংকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে যে, মাও-ৎসে-তুং নাকি কোনও দিনও সাচ্চা কমিউনিস্ট ছিলেন না এবং মাও-ৎসে-তুং নাকি চীন বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা পরিগ্রহণ করতে দেননি।

এ সকল ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কোনও দেশের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ছিলেন না। এবং তাঁরা অনায়াসেই বাস্তব সত্যকে চাপা দেবার জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতাকেই মার্কসবাদের নামে চালাতেন। তা না হলে, ভারতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কমিউনস্টদের বিরোধের কোনও কারণই ছিল না।

আজ দেখা যাচ্ছে , ২৮ বছর পূর্বেকার সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পন্থাকেই প্রকারান্তরে আজকের কমিউনিস্ট দল ও উপদলগুলো নিজেদের পছন্দমতো ' 'লেবেল' লাগিয়ে চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এতেই বোঝা যায় ওদের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে ওরা কত দেউলিয়া।

যাই হোক, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, আজকের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়ন করে, ঘোষণা করে যে—২৮ বছর পূর্বেকার ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্দেশিত বৈপ্লবিক পন্থায় পরিপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য আজ আর অক্ষুণ্ণ নেই। অর্থাৎ, ১৯৩৯ অথবা '৪০ সালে সুভাষচন্দ্র নির্দেশিত বামপন্থী ঐক্যের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের

মারফৎ যদি রাষ্ট্রশক্তি কব্জা করা হত, তা হলে দেশ আজ সমাজতন্ত্রের পথে অনেক উল্লেখযোগ্য স্তর অতিক্রম করে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যোগ্যতম অংশীদার রূপে বিরাজ করত। অপরদিকে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অবস্থা আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। সোজা কথায়, সুভাষচন্দ্রের প্রতি ভারতের বামপন্থীদের অসহযোগিতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতির রথচক্রকে নিদারুণ ভাবে বিধ্বস্ত করেছে। সেদিনের সেই অমার্জনীয় রাজনৈতিক অপরাধের খেসারত, আর সেই পুরাতন পন্থা অনুসরণ করে, দেওয়া সম্ভব নয়। সে দিনের বামপন্থীদের সংগ্রামী ঐক্য জাতীয় জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারত—আজকের বামপন্থী ঐক্য তা করতে পারবে না। আজকের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী ঐক্য বা ওই ঐক্যলব্ধ ফলাফলকে কথঞ্চিত পরিমাণে কাজে লাগানো যেতে পারে মাত্র।

প্রসঙ্গত ফরওয়ার্ড ব্লকের ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের পবিত্র দিনে, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ ভারতের বাস্তবতা আজকের কংগ্রেসি ভারতে আর বর্তমান নেই। তাই দেশের বর্তমান বাস্তবতায় ভারত তথা বিশ্বের পরাধীন দেশ সমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিন্তা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আজ দেশের মেহনতী অর্থাৎ খেটে খাওয়া কোটি কোটি মানুষের মুক্তির একটি মাত্র পথই খোলা আছে—তা হল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যারা রকমারি ও গালভরা ভাষণ দিয়ে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র', 'জাতীয় গণতন্ত্র', অথবা 'জনগণের গণতন্ত্র' প্রভৃতি আখ্যায় দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের পুনরায় বিভ্রান্ত করার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই যুগ পুরাতন বামপন্থী ঐক্যের পন্থাকে নতুন মোড়কে জড়িয়ে ফেরি করতে নেমেছে, তাদের সম্পর্কে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেওয়াই সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা দিবসের পবিত্রতম দায়িত্ব বলে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব মনে করে।

২২ জুন, ১৯৬৮।
ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা দিবস স্মারকগ্রন্থ।

নেতাজীর অমর আদর্শকে অম্লান রাখুন

নেতাজীর আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে এটা দেশের পক্ষে কল্যাণের কথা। আমাদের দেশের চরম ব্যর্থতার কারণ হল নেতাজীর আদর্শবাদকে জনজীবনে প্রচারের চেষ্টা করা হয়নি।

নেতাজীর আদর্শবাদকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বিভিন্ন দিক থেকেই হয়েছিল এবং হচ্ছে। নেতাজীর জন্ম দিবসে এখনও ভারত সরকার ছুটি ঘোষণা করেনি ।বামপন্থী নামে খ্যাত একটি দলও নেতাজীর জন্ম দিবসে নিস্পৃহ মনোভাব অবলম্বন করে থাকছে।

আর এক শ্রেণীর অসমসাহসিক তরুণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এরা নেতাজীর বৈপ্লবিক দর্শনের খুবই অনুরাগী। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত, নেতাজীর বা লেনিনের মতো বিপ্লবীরা বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গ্রহণ করেও বিপ্লববাদ থেকে বিচ্যুত হননি। এই উভয় বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ জননায়ক সারা দুনিয়ায় শোষিত ও লাঞ্ছিত মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দুর্বার করেছেন।

নেতাজী ছিলেন সার্থক বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী মহানায়ক। তবু তিনি এই দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অতীতেও ভারতে সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক যুগে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে। নেতাজী জানতেন এই দরিদ্র দেশে

সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে না। নেতাজী শ্রেণী সংগঠনে এবং শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তাঁর মানবিকতাপূর্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা ছিল। তবে ব্রিটিশ জনগণকে তিনি ঘৃণা করেননি। বরং ইংরেজ জাতির অধ্যবসায়, কর্মপ্রচেষ্টা, দুঃসাহসিকতা ও নিয়মানুবর্তিতাকে তিনি পছন্দ করতেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শত্রু জার্মান ও জাপানের বন্ধুত্ব কামনা করলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিকল্পনা তাঁকে আকৃষ্ট করে।

যখন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব ছিল তখন কংগ্রেসের আপষকামী নেতৃত্ব ইংরেজের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধে। ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার গোড়াতে Interim Government প্রতিষ্ঠা করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখলের জন্য অস্থির হয়ে যান, কারণ তাঁদের ভয় ছিল হয়ত নেতাজী তখনই ভারতে ফিরে আসতে পারেন।

নেতাজী যুদ্ধোত্তর যুগের বিপ্লবী পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের আহ্বান জানান। তখন আজাদ হিন্দের প্রেরণায় সমগ্র দেশেই যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয় তাতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাই সম্ভব ছিল। কংগ্রেসের মতো ভারতের তদানীন্তন কমিউনিস্ট নেতৃত্বও সংগ্রাম বিমুখ ছিলেন। ভিন্ন দেশের স্বার্থে পরিচালিত হয়ে তাঁরাও দেশের বিরাট সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করছেন।

নেতাজী জাতীয়তাবাদী হয়েও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জন করে ভারতে সমাজতান্ত্রিক, সুখী ও শ্রেণী বৈষম্যহীন রাষ্ট্র কায়েম করে সোস্যালিস্ট দুনিয়ার মেহনতী মানুষের গণসংগ্রামকে শক্তিশালী করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। নেতাজী জানতেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হবে এবং ভারত সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার বন্ধু হয়েও জোট নিরপেক্ষতার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। নেতাজীর বৈপ্লবিক আদর্শবাদ গ্রহণের মধ্য দিয়েই দেশের তারুণ্য মুক্তির সন্ধান পাবে।

২৩ জানুয়ারি, ১৯৭১।
নেতাজী জন্মোৎসব স্মারকগ্রন্থ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলুন

সহযোগী প্রতিনিধি, সহকর্মী ও বন্ধুগণ,

আমরা আজ এক সঙ্কটময় মুহূর্তে এখানে মিলিত হয়েছি। ১৯৬৬ সালে মাদুরাইতে দলের বিগত অধিবেশনের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের রাজনীতির চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিভাবে আমরা তার সম্মুখীন হব, এই সম্মেলনে তা স্থির করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকসন সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী এমন এক জঙ্গি নীতি অনুসরণ করছে, যার ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড় রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে তারা আজও ভিয়েতনামে বর্বর হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিজম প্রতিরোধের নামে তারা বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েলি আক্রমণের পেছনে এদের উস্কানি রয়েছে। ইজরায়েলিরা বেআইনী ভাবে বিস্তীর্ণ আরবভূমি দখল করে রয়েছে এবং প্রতিদিন আরব দেশগুলির ওপর বোমাবর্ষণ করছে। বর্তমানে সেখানে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইজরায়েলের এই কুকর্মের পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। ইউরোপে এরা আজ 'ন্যাটো' সামরিক জোটকে জোরদার করছে এবং যুদ্ধবাদকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ সাম্রাজ্যবাদীদের এই চক্রান্ত প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সর্বত্র তারা সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে এবং সর্বত্র শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দীর্ঘদিনের উপনিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু এখনও কয়েকটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন রয়েছে। হংকং ও জিব্রাল্টারে ব্রিটিশ উপনিবেশ রয়েছে, ম্যাকাও, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিকে রয়েছে পর্তুগিজ শাসন। এই সব দেশের মুক্তিকামী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ উননিবেশবাদের ভগ্নাবশেষ নিশ্চিহ্ন করার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীরা উগ্র বর্ণবৈষম্যের নীতি অনুসরণ করছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পদানত রাখার জন্য ঘৃণ্য ফাসিস্ত কায়দায় চলছে। তবে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে যে জাগরণ হয়েছে, তার ফলে এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে শ্বেতশাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান ও মূলধন বিনিয়োগের সুযোগে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং কোথাও কোথাও ফরাসি ও জার্মান একচেটিয়া শিল্পপতিরা অনুন্নত দেশে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই সব দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করছে।

সাম্প্রতিক কালে সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেতে চায় তারা চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও কোনও আচরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হয়ে চীন সম্প্রসারণবাদের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। চীন এখনও ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে রয়েছে এবং চীন যে ভারতীয় অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিছুদিন পূর্বে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জোর সীমান্ত সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ গোষ্ঠী ভুক্ত দেশ চেকোস্লোভাকিয়ায় যে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে, তা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। আলেকজান্দার দুবচেকের নেতৃত্বে পরিচালিত চেক কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার যদি সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েও থাকে, তবুও বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপ কোনও ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। এই ঘটনার ফলে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও এই শিবিরের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের যেখানে যে সংগ্রাম চলছে, তার পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সর্বতোভাবে সেই সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে। পুঁজিবাদীদের আঘাতের বিরুদ্ধে আমরা সর্বদা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সমর্থন করব। কিন্তু যদি কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ করে কিংবা সামগ্রিক ভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও কার্যে লিপ্ত হয় তাহলে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভবকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে ভারত বিরোধী নীতি অনুসরণ করছে এবং পুরনো কায়দায় সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই ভারত বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সর্তক থাকতে হবে।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় ও লোকসভায় এই দলের আসনসংখ্যা হ্রাসের ফলে দেশে এতদিনের একচেটিয়া কংগ্রেস শাসনের অবসান হয়েছে। ১৯৬৯ সালের 'ক্ষুদে সাধারণ নির্বাচনে', অর্থাৎ পশ্চিমঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে। তেইশ বছর ধরে কংগ্রেসি কুশাসনে জর্জরিত সাধারণ মানুষ আজ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করতে এগিয়ে এসেছে। দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি এবং শ্রমিক ও কৃষকের একটানা সংগ্রামের ফলেই এই জিনিস সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয় কোনও সন্দেহ নেই যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পক্ষে একক ভাবে কেন্দ্রে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না।

কংগ্রেস আজ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একটি দল অপরটির তুলনায় প্রগতিশীল, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। পুঁজিবাদীদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অন্তর্নিহিত সংঘাতের ফলেই কংগ্রেস দলে এই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেসের উভয় গোস্ঠিই পুঁজিবাদীদের স্নেহধন্য। ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেবার নানা চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই দলের বোম্বাই অধিবেশনের পর এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সমাজতন্ত্র নয়, পুরনো মিশ্র অর্থনীতিই তারা অনুসরণ করবে।

কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে বেড়িয়ে আসা এদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং এই কারণে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য কোনও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এরা গ্রহণ করতে পারেনি।

ব্যাপক ও পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও ১৪টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণকে আমরা সমর্থন করেছি এবং ভবিষ্যতেও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কোনও ভাল কাজ করলে আমরা তা সমর্থন করব। বরং কংগ্রেসের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে সর্বস্তরে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা যায়।

অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রায়-অবলুপ্তির ফলে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বামপন্থী দলগুলির সম্মুখে এক নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে এবং অপর কয়েকটি রাজ্যে তারা অন্য দলের সঙ্গে একত্রে অ-কংগ্রেসি সরকার স্থাপন করেছে। এই সরকারগুলি জনসাধারণের স্বার্থে কিছু ভাল কাজ করলেও, এই সব সরকারের কার্যপরিচলনায় যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ আছে। অনেকগুলি রাজ্যে আইনসভা সদস্যের দলবদল আজ একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জনগণের কল্যাণ চিন্তার পরিবর্তে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থ তথাকথিত অকংগ্রেসি সরকারের পেছনে কাজ করেছে। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বাড়াবাড়ির ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের দলীয় স্বার্থে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করছে এবং তারা তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিতেও ইতস্তত করছে না।

জনসাধারণ কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে অ-কংগ্রেসি সরকার পরিচালিত হচ্ছে তাও তারা চায়নি।

ইদানীংকালে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আন্দোলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেসের শক্তিহ্রাস, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং অপর কয়েকটি রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি যদি মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করে সর্বনিম্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়, তাহলে এই সব সরকারের পক্ষে জনগণের স্বার্থে কার্যকরী কিছু করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

কেরলের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, পঞ্চদলের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের

সঙ্কীর্ণ নীতির জন্য জনগণের দ্বারা কোনঠাসা হয়েছে। অচ্যুত মেনন সরকার যতদিন জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন ততদিন তাঁরা দেশের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট এখনও কাটেনি, বরং অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এই সঙ্কট আরও ঘনীভূত হবে। আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে বারে বারে ঘোষণা করেছি, আমরা বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষা করতে চাই এবং ফ্রন্ট থেকে কোনও দলকে বাদ দেবার চেষ্টা আমরা সমর্থন করব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, যেভাবে বর্তমানে পশ্চিমঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও সরকার চলছে, তাও চলতে পারে না। আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্কীর্ণ ও ঐক্যবিরোধী আচরণের ফলে যুক্তফ্রন্টে বর্তমানে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলার নিশ্চিত অবনতি ঘটেছে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি যন্ত্রের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। এই দল মুখে মার্কসবাদের কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে আজ মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে জোরদার করার পরিবর্তে অন্য বামপন্থী দলের বিরুদ্ধাচরণের কাজেই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। পুলিশের পরোক্ষ সমর্থনের জোরে এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তি, জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের লোকদের সাহায্যে এরা আজ অপর বামপন্থী দলের কর্মীদের ওপর একটানা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। কিন্তু কেউ যদি আমাদের কোনও কর্মীর ওপর হামলা করে, তাহলে আমরা অবশ্যই পাল্টা আঘাত করব।

পশ্চিমবঙ্গে যদি যুক্তফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং জনগণের স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট ও সরকারের কাজ পরিচালনা করতে হয়, তবে আসুন, যুক্তফ্রন্টের সভায় বসে সকল সমস্যার আলোচনা করুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং সিদ্ধান্তগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকরী করুন। এই পথেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আমাদের আজ অন্তর্দলীয় বিরোধ বন্ধ করতে হবে। কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী গণআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতেভীত ও বিচলিত এবং এই আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য আজ তারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। আমাদের সম্মিলিতভাবে এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে এবং মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে— ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে রচিত এই সংবিধান আজ সকল প্রকার প্রগতি ও সমাজকল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা ও আরও বেশি অর্থ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের জন্য আমাদের দাবি জানাতে হবে।

বামপন্থী দলগুলির ঐক্য আজ একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে চাই এবং কেন্দ্রে স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টাকে রুখতে চাই, তবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে এরূপ একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের দ্বারাই আমরা কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থার সম্মুখে একটি কার্যকরী বিকল্প নেতৃত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হব।

আমি জানি, সর্বভারতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথে অনেক বাধা রয়েছে। তথাপি আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আজ আমি দেশের সকল প্রগতিশীল দলের কাছে আহ্বান জানাই, আসুন, কেবল সরকার গঠনের জন্যই নয়, মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মসূচি ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হোন।

সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল দলগুলির যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করলেও একথা আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি যে, এই জাতীয় ফ্রন্ট ও সরকার গঠনের দ্বারা জনসাধারণের কিছু উপকার করা গেলেও জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান এই পথে সম্ভব নয়। ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রায় সমাধি রচিত হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আরও বেশী সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রতিদিন কিছু কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং হাজার হাজার নর-নারী বেকার হচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থাই বলতে গেলে হচ্ছে না। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ক্রমবর্ধমান বিদেশি ঋণের ভারে আমরা নুয়ে পড়ছি। পুঁজিবাদের মধ্যে এই সব সমস্যার কোনও সমাধান নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই আজ বাঁচার একমাত্র উপায়, এবং বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের মহান নেতা নেতাজী এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। মার্কস ও লেনিনের শিক্ষাও তাই।

ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-কাছারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যত্র যে সংগ্রাম চলছে, তাকে আরও সংহত আরও শক্তিশালী করুন এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন। বিশ্বের কোথাও আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং ভারতেও আমাদের এ ব্যাপারে কোনও মোহ রাখলে চলবে না। নির্বাচনে আমরা অংশ গ্রহণ করব, প্রয়োজন মতো সরকারেরও দায়িত্ব নেব কিন্তু এ সবই সাময়িক ব্যাপার। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

কিছু বন্ধু মনে করছেন, ভারতে এখনই সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এমন সব কাজ করছেন যার ফলে কার্যত বিপ্লবেরই ক্ষতি হচ্ছে। বিপ্লব সাধনকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বপ্রযত্নে তার জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।

সহকর্মী বন্ধুগণ, চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন এবং দলের সংগঠনকে সেইভাবে গড়ে তুলুন।

ভারত আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। কোন পথে সে এগোবে? একমাত্র নেতাজীর আদর্শের মধ্যে ভারতের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। প্রত্যেকেই আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। এমনকি মোরারজি দেশাই-এর মুখেও সমাজতন্ত্রের বুলি শোনা যাচ্ছে। আসল প্রশ্ন হল, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ কী ? বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র হতে পারে না। ভারতে সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়াতে হবে। এখানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে এই দেশের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে। নেতাজীর আদর্শের মধ্যেই আমরা কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র, বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ, এই তিনটি নীতির একত্র সমাবেশ দেখতে পাই।

নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লককে আজ দেশের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের কথা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, দলের নিঃস্বার্থ ও সংগ্রামী কর্মীরা নেতাজীর পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং দেশকে তার মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারবেন।

বন্ধুগণ, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আপনাদের কাছে এই আহ্বান জানিয়ে যাই, সম্মেলনের এই কয়দিন বিভিন্ন সমস্যার ওপর গভীর ভাবে বিবেচনা করুন এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করুন। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার ভরসা আছে, দেশের সম্মুখে সঠিক পথের সন্ধান তুলে ধরতে আপনারা সক্ষম হবেন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
নেতাজী জিন্দাবাদ।
জয় হিন্দ্‌।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নবম
প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।
কলকাতা ১৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০।

ভাষণ সংগ্রহ

I Condemn It

Mr. Speaker, Sir, the Budget has been criticised and condemned not only by the members of the Opposition but also by the supporters of Government. Now if the Government supporters vote with the Opposition then the defeat of the budget is assured, there is no doubt about it. At least a large number of grants will be rejected.

Sir, the budget presented to us by the Hon'ble Finance Minister belies the expectations of millions and millions of people. The bulk of the people have to pass their days half fed and half clad, and the children have to go without milk and the sick without medicines. In the Budget I do not find any provision for free and compulsory education. Thousands of people in this country are dying of malaria and cholera and other epidemics. Only a sum of Rs. 3 lakhs has been set apart for the control of malaria. Why try to control? Why not eradicate it altogether? You want to control because by controlling you will be able to provide some of your supporters. There is no scheme to eradicate the evil. Only Rs. 2 lakhs have been set apart for maternity and child welfare. Sir, there is a proverb in English that child is the father of man, but in our poor country the child dies before the father. You want to build the nation; children are the future nation. I submit, Sir, that Rs. 2 lakhs is quite insufficient to build the future nation.

Now about food, Sir. The Grow More Food Scheme is, I submit, Sir, complete failure. Instead of growing more food you are growing corruption. The other day a friend on the side of Government was making section 93 responsible for the failure of the food policy in Bengal. But he was avoiding the name; as the Bengali proverb says, the name of *bhadra bou* is avoided in the case of the elder brother of her husband. The Food Commissioner was practically responsible for the failure of the Food policy in Bengal. You had not the courage to

remove him . Sir, in Calcutta, if you go round the city in the morning you will see that hundreds of people are standing in queues like beggars near the ration shops and waiting for hours and hours at the loss of valuable time. Why should you patronise certain ration shops? Why should you allow your patronage to be monopolised by certain shops only? Why don't you allow every shop to have rationed articles, so that the people of Calcutta can get rationed articles of their own choice without any hardship or trouble.

Then, Sir, about labour, there is no scheme in the Budget for relief of labour. The labourers in Bengal work for eight hours and in certain factories they get Rs. 12 to Rs. 14 only. There is a strike in one Factory. There the workers are on strike. Some of them--some 20--had been arrested by the police. They have been beaten, they have been injured and they came here. As I said before, Sir, there is no scheme for relief of labour. Labourers must have a living wage and compensation for their old age and for injuries received. But nothing has been done and the scheme has not been prepared for that.

Then I come to sales tax. You know, Sir, that there is a country-wide agitation about sales tax. I understand that certain supporters of the Hon'ble Chief Minister have been exempted from payment of sales tax by lakh of rupees.

2 August, 1946

রাজ্য আজ কোন পথে?

ডেপুটি স্পিকার মহাশয়,সরকারের গ্রো মোর ফুড স্কিমে বাংলাদেশে যে খাদ্যসমস্যা সমাধান হয় নি তা আমরা জানি। গভর্নমেন্টের গ্রো মোর ফুড স্কিমে দেখা যায়, যে বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, গভর্নমেন্টের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অনভিজ্ঞ অফিসাররা যে সময় আমন বীজ দেওয়া উচিত ছিল সেখানে আউশ বীজ আর যেখানে আউশ বীজ দেওয়ার কথা সেখানে আমন বীজ দিয়েছে। যদি সত্যি সত্যিই গভর্নমেন্টের ইচ্ছা থাকত যে বাংলা দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে তাহলে এই সমস্যা সমাধান করা শক্ত হত না। বিলেতে যুদ্ধের সময় তারা এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখেনি, সেই জমি দিয়েই যাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয় সেই ব্যবস্থা করেছে। আমি ৩/৪ দিন আগে কলকাতার আশপাশে—দমদম, উল্টাডাঙ্গা গিয়ে দেখেছি যে সেখানে অনেক জমি পড়ে আছে। মহিষবাথানে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে প্রায় হাজার দু'হাজার বিঘা ভাল জমি পড়ে আছে। কলকাতার আশপাশে বহু বাস্তুহারা রয়েছে যারা মুসলমানদের ঘরে রয়েছে ,তাদের এই সমস্ত জমি দিয়ে, খাদ্য উৎপাদনের জন্যই হোক বা পুনর্বসতির জন্যই হোক ,কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশে আরও অনেক জমি পড়ে আছে। যদি হিসেব করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে হাজার হাজার বিঘা জমি পড়ে আছে। আমার কাছে একজন একটা স্কিম নিয়ে এসেছে যে বগুলার আশপাশে ৩০ খানি গ্রামে যদি মাইনর ইরিগেশন স্কিম নিয়ে কাজ হয় তা হলে এখন যা ধান হচ্ছে তার দ্বিগুণ ধান হবে। গ্রো মোর ফুড স্কিমে দেখা যায় যে কর্মচারীদের বেতনে যা খরচ হয়েছে তার তুলনায় ফলন কিছুই বাড়ে নি। কাজেই গ্রো মোর ফুড স্কিম যে সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে তা আর বলতে হবে না। যদি সত্যিই সরকার দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে চায় তা হলে যেখানে যত জমি পড়ে আছে সেই জমিগুলি গ্রহণ করা উচিত। অনেক জায়গায় জমি আছে চাষী নেই। কিন্তু আমি জানি যে এই সমস্ত বাস্তুহারাদের মধ্যেই অনেক চাষী আছে। এক হেলেঞ্চায় চারশ ঘর চাষী আছে।-সেখান থেকে বহু লোক এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দুঃখের কথা জানাবার জন্য। শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখাও করেছিল এবং বলেছিল যে তাদের যে ১৫ বিঘা করে জমি দেওয়ার কথা ছিল তা তারা পায় নি এবং তাদের যে ঋণ দেওয়ার কথা ছিল তাও তারা পায়নি। এই সব চাষীদের, এই যে সমস্ত জমি পড়ে আছে তা দিয়ে, যদি সাহায্য করা যায় তা হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যেত এবং সেই সাথে পুনর্বসতিরও কাজ হত।

অনেক সময় অনেক রিপোর্ট পাওয়া যায় যে বাস্তুহারারা লোন নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে বা টাকাটা অন্য খাতে খরচ করে ফেলেছে। এটা সবসময় ঠিক নয়। কারণ বাস্তুহারাদের ঘরবাড়ি সব কেড়ে নিয়ে তাদের গৃহহীন করে যদি মোট ৫০০ টাকা দেওয়া যায় তা হলে তারা কী করে এই ৫০০ টাকায় পুনর্বসতি করতে পারে? আপনার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে শুধু ৫০০ টাকা দিলে আপনি ছেলেপিলে নিয়ে কী করে এই পুনর্বসতি করবেন? আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করি যে আজকে যদি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে ৫০০ টাকা দেওয়া যায় তবে তিনি ছেলেপিলে নিয়ে কী করবেন? অবশ্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিবাহই করেননি, তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু এখানে আরও মন্ত্রী মহাশয়রা আছেন তাঁরা এটা বিবেচনা করবেন। যে টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে সে টাকা খরচ করে অনেকেই চেষ্টা করে এই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, তখন তারা দুঃখের বোঝা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এদের যেভাবে লোন দেওয়া হচ্ছে যে--প্রথমে ১০০ টাকা দিল, আবার পরে ১০০ টাকা দেয়, এতে তারা অভাবে পড়ে অনেক সময় খরচ করে ফেলে। এছাড়া টাকা নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেছে এরকম সংখ্যা খুবই কম। কাজেই এইগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে দেখা দরকার। তারা যে ঋণ পাচ্ছে তা দিয়ে যদি একটা ভাল লোককে দিয়ে একটা ভাল স্কিম তৈরি করে যে সমস্ত জমি পড়ে আছে তাতে যদি এই সমস্ত লোকদের বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গ্রো মোর ফুডের আর কোনও অসুবিধা হয় না। বহু জমি পড়ে রয়েছে জমিদারের হাতে। কিন্তু আমাদের এই সরকার জমিদার ও শিল্পপতিদের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সেইজন্য এই গ্রো মোর ফুড সব রকমে বিফল হয়েছে। অনেক ইরিগেশন স্কিম আজও সম্পূর্ণ করেনি। 'গুড়গুড়ে' নদী, যেটা কেটে দিয়ে অনেক জমি চাষ করা যেত পারতেন এবং এতে অনেক পরিমাণে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হত। সরকারের প্রধান কর্তব্য হল যে যদি তারা সত্যি সত্যি খাদ্য উৎপাদন করা দরকার বলে মনে করে তা হলে তাদের এই সমস্ত ছোট ছোট মাইনর ইরিগেশনগুলি হাতে নেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য যেগুলি বড় বড় নদী নালা, না কেটে কোনও লাভ হবে না, তার কথা আলাদা। অনেক জমি পড়ে আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে এই পুনর্বসতির কাজে লাগানো হোক।

মালদহে এই সব ২০ হাজার রিফিউজিকে মুসলমানদের বাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়। এখন অনেক মুসলিম ফিরে এসেছে। এখন এই সব রিফিউজি কোথায় যাবে? এমন জায়গায় এই সমস্ত রিফিউজিদের ঘরবাড়ি দেখানো হচ্ছে যেখানে গ্রীষ্মকালেও ১০/১২ হাত জল। অথচ রিফিউজিদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অমানুষিক কান্ড। পুনর্বসতি করা, যেটা সরকারের উচিত ছিল সেটা

করেনি। চাঁদিপুর কলোনিতে একজন ভাল অফিসার সত্যি ছিলেন যিনি রিফিউজিদের দরদী ছিলেন। তিনি সত্যি খুব ভাল করে কাজ করছিলেন কিন্তু তাঁকে হঠাৎ অভিযোগ এনে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই সব রিফিউজিদের এমন সব জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ,এবং ৫০০ টাকা লোনও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে কিছু করে খাওয়ার কোনও সুবিধাই নেই। ব্যবসা বাণিজ্য করে খাবে এমন কোনও উপায়ও নেই। এই সব রিফিউজিদের মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত যুবক আছে যারা খাটতে রাজি, কিন্তু কোনও সুবিধাই নেই। আমি সেদিন বাঁকুড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম বাস্তুহারাদের এক বিঘা করে জমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে জমি এমনই খড়িমাটিতে পূর্ণ যে সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতে পারে না। সেখানে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, যেমন তাঁত প্রভৃতি করে কিছু কিছু লোক সামান্য উপার্জন করছে বটে কিন্তু বাকি যারা তাদের কী উপায় হবে? ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুখ-সুবিধা নেই, এসব কী করে বাঁচবে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। সেদিন বর্দ্ধমান থেকে ফেরার সময় দেখলাম ট্রেনে করে বহু লোক চাল নিয়ে আসছে। সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টর তাদের ধরে কিছু কিছু নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি এদের একজনের সঙ্গে আলাপ করলাম। এরা বলল, এই ২/৩ সের চাল বিক্রি করে এনেই আমাদের মা-বোনেদের কোনওরকমে একবেলা করে খাওয়াচ্ছি। আমরা কী করব, আমাদের এছাড়া কোনও উপায় নেই। এদের মধ্যে অনেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস পর্যন্ত আছে। আমি বলব, এই সব যে দুর্নীতি হচ্ছে এর জন্য সরকারই দায়ী। এদিকে আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন,কিন্তু তিনি বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই করছেন না। এইসব মধ্যবিত্ত পরিবারের যেসব যুবক এইভাবে জীবন যাপন করছে তাদের জন্য কি কিছুই করা যায় না ? নানা রকম শিল্প গড়ে তুলে এই সব হাজার হাজার শিক্ষিত যুবককে সহজেই কাজে লাগানো যায়। দেশের সম্পদও বাড়ে। কিন্তু জনসাধারণের দিকে সরকারের কোনও দৃষ্টিই নেই।

তারপর ডিপ সি ফিশিংয়ের কথা। বাংলার অধিবাসীর প্রধান খাদ্য মাছ। কিন্তু কত মাছই যেন আমরা খাচ্ছি! লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ট্রলার এনে বিদেশি এক্সপার্ট আনিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করা হল, আজ পর্যন্ত কোনও ফল আমরা দেখলাম না। শুনতে পাই যে এই এক্সপার্টরা এক একজন নাকি লাট সাহেবের মতো মাইনে পায়। কিন্তু এত সব করে কী যে কাজ হল জানি না। কোনও জনকল্যাণকর প্ল্যানের কথা বললেই সরকার বলে টাকা নেই। কিন্তু এই বেলা কোথা থেকে টাকা আসে? জনসাধারণের সত্যিকারের হিত কীসে হবে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। এই মন্ত্রিমন্ডলীর কেবল লক্ষ্য হচ্ছে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কী করে এইসব বড় বড় প্ল্যান মারফৎ টাকা পাবে। সেদিকেই লক্ষ্য। এছাড়া আর কী বলব।

কাঁথিতে যেসব জমি পড়ে আছে সেখানে সমবায় পদ্ধতিতে সল্ট ম্যানুফ্যাকচার হতে পারে। দেশের বহু যুবকের সংস্থান হতে পারে। কিন্তু তা না করে বিলেত থেকে এক্সপার্ট আনিয়ে বড় বড় স্কিম করা চাই, লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মতো খরচ করা চাই, কাজ কী হবে না হবে সেদিকে কোনও লক্ষ্যই নেই। এই সব না করে পশ্চিমবাংলায় যে সব বড় বড় বিল পড়ে আছে, দীঘি পড়ে আছে, তা সংস্কার করলে মাছের সমস্যা অনেক মিটত, দেশেরও উপকার হত। এসব না করে কেবল বড় বড় স্কিম কাজেই মন্ত্রীরা এই সবেই ইন্টারেস্টেড। এছাড়া আর কী বলব।

নীল আলো জ্বলে ওঠে। ডেপুটি স্পিকার বলেন, আর পাঁচ মিনিট বলুন।

আমি আরও ২০/২৫ মিনিট বলে শেষ করব। তারপর ক্যালকাটা মিউনিসিপাল বিলের কথা বলছি। এই বিল আনা হয়েছিল যাতে বড় বড় দুর্নীতিপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দোষ চাপা পড়ে। যারা এতে দোষী তাদেরকে রেহাই দেয়, আর যেসব কর্মচারী নির্দোষ এবং নিরীহ তাদেরকে অল্প দোষে, এবং অনেক সময় বিনা দোষে কোনও না কোনও অভিযোগ চাপিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। গরিব দরিদ্র কর্মচারীদের সাসপেন্ড করে রাখা হয়। আর বড় বড় কর্মচারীর বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আছে, কত টাকা তারা আন্ডার অ্যাসেসমেন্ট করে দেশের ক্ষতি করছে, কিন্তু তাদের কিছু হয় না। দেশের জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে এই বিল আনা হয়েছে এবং দেশের জনমতকে গলা টিপে মারা হয়েছে। এরকম করলে জনসাধারণ সহ্য করবে না, বিপ্লবের পথে আপনিই এগিয়ে যাবে। ইতিহাস কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

তারপর প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্টে বহুলোককে আটকে রাখা হয়েছে। হরিপদবাবু যে কথা বলেছেন তার আর পুনরুক্তি করতে চাই না। ১৯২৭ সালে, সকলেই জানেন, শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু যখন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তিনি তখন জেলে ছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁকে কারামুক্ত করা হয়। তখন বিদেশি সরকার ছিল, এত যে খারাপ সেই বিদেশি সরকারও জনমতকে শ্রদ্ধা দেখাল। কিন্তু আমাদের এই সরকার, দেশী স্বাধীন সরকারের আমলে কী দেখছি—নির্বাচন হয়ে গেল, স্বাধীনতার পর অ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইজ নীতিতে ভোট হল, তারা হাজার হাজার লোকের ভোটে অ্যাসেম্বলিতে ও পার্লামেন্টে নির্বাচিত হল, বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে জনসাধারণ লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু তাঁরা আজও জেলেই আটকে রইলেন।

আমি প্রিভেনশন অব ডিটেনশন অ্যাক্ট সম্বন্ধে বলছিলাম, যাদের ধরা হয়েছে গত নির্বাচনের সময়। কোনও জায়গায়ই কোনও গন্ডগোল ঘটেনি। সব

শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে এবং এর পূর্বে কোনও দিন দেশে কোনও গন্ডগোল ছিল না। যদিও আমরা মনে করি যে যাদের আটক রাখা হয়েছে তারা যদি কোথাও কোনও গন্ডগোল করে থাকে তার জন্য যতখানি সরকার দায়ী ততখানি তারা দায়ী নয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলে দেখা গেছে যারা অরাজকতা করেছে তাদের দুবছর, তিনবছর ধরে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ যখন কোথাও দেখেছেন কোনও গন্ডগোল হচ্ছে তখন যাদের আটকানো দরকার বলে মনে করেছেন তাদের আটক করেছেন। আবার যখন নরমাল কন্ডিশন ফিরে এসেছে, তখনই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন বর্তমান গভর্নমেন্ট কোন অজুহাতে তাদের আটক করছে ? দেশের জনসাধরণের ভোটের দ্বারা যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের ওপর শ্রদ্ধা দেখিয়ে জয়যুক্ত করেছেন, জনসাধারণ যাঁদের উপর আস্থা রেখে তাদের প্রতিনিধি করে অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কী কারণে জেলে নিয়ে যাওয়া হল? এর কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ দেখা যায় যে এঁদের গায়ের জোরে আটক রাখা হয়েছে। এঁদের মনে গণতন্ত্রের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি যদি একটু মাত্রও শ্রদ্ধা থাকে তাহলে যাঁরা গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের অচিরে মুক্ত করে দেওয়া উচিত ও প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট তুলে নেওয়া উচিত।

জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এতে জনসাধারণের সুবিধা যে কতখানি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দেখা যায় বহু অনভিজ্ঞ লোককে, এদের গুণ না থাকলেও এখানে এনে বসানো হয়েছে। গাড়িগুলির অবস্থাও শোচনীয়, সেগুলি ভালভাবে পরিষ্কার পর্যন্ত করা হয় না। গাড়িগুলির এমন অবস্থা যে অনেক সময় গাড়ি রাস্তায় চলতে চলতে খারাপ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মোটা মোটা মাইনে দিয়ে বহু কর্মচারী রাখা হয়েছে যত সংখ্যা দরকার তার চেয়েও বেশি। আমি দেখেছি, এই সমস্ত কন্ডাক্টরদের মধ্যে অনেকেই ম্যাট্রিকুলেট বা আই এ ফেল ছেলে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা কত মাইনে পাও? তারা বলল, আমরা মাত্র ৮৫ টাকা পাই এবং আট ঘন্টা করে পরিশ্রম করতে হয়। এই সমস্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা টিকিট বিক্রয় করে আট ঘন্টা করে খাটছে এবং অনেক সময় এরা যা মাইনে পায় তার চেয়ে অ্যাভারেজে প্রায় ১৫-২০ টাকা করে কমে যায়। তার কারণ, অনেক সময় টিকিট বিক্রয়ে ভুল হয়ে যায়। যার ফলে তাদের পকেট থেকে এই দন্ড দিতে হয়। মাত্র ৮৫ টাকা মাইনে এবং আট ঘন্টা করে খেটে তাদের স্বাস্থ্য রাখা সম্ভব? এই সমস্ত কন্ডাক্টর ও ড্রাইভার যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাদের দিকে

সরকারের দৃষ্টি নেই। সরকারের দৃষ্টি হচ্ছে তাদের হাতের লোককে, তাদের উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশন থাক বা না থাক, তাদের মোটা মাইনে দিয়ে কাজে বসানো। এইজন্য দেখা যায় যে প্রত্যেকটি প্রাইভেট বাস গরে হাজার টাকা করে লাভ করে। আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের লাভ তো হয়ই না, বরং প্রত্যেক বারই লোকসান হচ্ছে। কেন হয় না? ন্যাশনালাইজেশনের মানে এই নয় যে জনসাধারণ ট্যাক্স হিসাবে যে টাকা গভর্নমেন্টকে দেয়, সেই টাকা নিয়ে অপব্যয় করা। স্টেট ট্রান্সপোর্টের ব্যয় বাদেও কিছু টাকা সরকারের তহবিলে জমা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। সরকারের দেখা উচিত যে এই সমস্ত ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর, যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাদের বেতন যাতে বৃদ্ধি হয়।

এখন আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন প্রবর্তন হয়েছে। গভর্নমেন্ট এক মাইলের ভিতর একটা করে স্কুলের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে বড় বড় গ্রাম এক মাইলের ভিতর আছে, সেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি বলে দুটি স্কুল না করলে চলে না। কারণ যে উদ্দেশ্যে এই স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মাইলে মেপে স্কুল না করে, বড় বড় গ্রামে যেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি সেখানে দুটি স্কুল না করলে গভর্নমেন্টের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারা জানেন এই প্রাইমারি স্কুলের বই নিয়ে পাবলিশাররা, যারা মধ্যবিত্ত লোক,বইয়ের ব্যবসা করে খেত, সরকারের নতুন পরিকল্পনার ফলে তাদের কী দুরবস্থা হয়েছে। বর্তমানে গভর্নমেন্ট "কিশলয়" বলে বইখানা মনোপলি করেছে। সে বই সকলের কেনার উপায় নেই। কয়েকমাস পূর্বে মফস্বল থেকে একজন ভদ্রলোক পয়সা খরচ করে কলকাতায় এসেছিলেন এই বইখানি কেনার জন্য। কিন্তু বইয়ের দোকানে এসে শুনলেন স্কুলের হেডমাস্টারের সার্টিফিকেট ব্যতীত এই বই দেওয়া হবে না। তিনি পূর্বে জানতেন না যে এই বইখানি কিনতে গেলে হেডমাস্টারের সার্টিফিকেট আবশ্যক। সাধারণের কেনার জন্য এ-বই বাজারে পাওয়া যায় না। সেইজন্য একটা প্রাথমিক স্কুল, যারা গভর্নমেন্টের স্ট্যান্ডার্ডে পড়াবে ঠিক করেছিল বলে এই বইয়ের জন্য চেষ্টা করেছিল, তারা সে বই পেল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সরকারের যারা অনুগৃহীত বা উপকৃত লোক তারা ছাড়া আর কেউ বই পাচ্ছে না। এই বইগুলি তাদের অনুগৃহীত পাবলিশারদের দ্বারা ছাপানো হয়। পূর্বে বহুলোক এই বই পাবলিশ করত, কিন্তু এখন তাদের জীবনধারণের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছে তাতে সরকারের হাতে ক্ষমতা এসেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণ সরকার-বিরোধী হয়ে উঠেছে। আজ যখন বিভিন্ন প্রেস আছে তখন সরকারের উচিত ছিল এই সমস্ত প্রেসে বই ছাপান। সরকারের উচিত ছিল একটা শুধু সিলেবাস ঠিক করে দেওয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই বই পড়ে বুঝতে

পারে কিনা সে বিষয় চিন্তা করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের লেখা এর মধ্যে আছে কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে এইগুলি পড়ে বোঝা খুবই শক্ত। এমনকি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরও এই বই পড়ে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া খুব শক্ত, কারণ তাদের পড়াশুনা করার সময় ও সুযোগ খুব কম।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাইনে এত কম যে তাতে তাদের সংসার চালানো অসম্ভব, আবার তারা এত দামে বই কিনে পড়বে কী করে? তারা যাতে সস্তা দামে বই কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বইয়ের দাম সাড়ে দশ আনা হতে পারে, কিন্তু আপনারা বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন নিজেদের পাবলিশারদের সুবিধার দিকে। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা করা হত যাতে দুই আনার বেশি দাম না হত, তাহলে দেশের জনসাধারণ, গরিব চাষী সকলেই এই বই কিনে পড়তে পারত।

বছরের পর বছর একঘেয়ে বই পড়তে হবে। যদি সিলেবাস ঠিক করে দেওয়া হত তাহলে সেখানে নানারকম বই থাকত। পাঁচ রকম বই দেখে সরকার একটা ভাল বই ঠিক করতে পারত। তা না করে তারা এই বই করেছে যেন মেড টু অ্যান্ড পেড টু অর্থাৎ একটা মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে সকলকে বেরতে হবে এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার মনে হয় এতে শিক্ষার উন্নতি হবে না।

নীল আলো জ্বলে ওঠে

আমি শেষ করে এনেছি। আর দু-একটা কথা বলে আমি শেষ করছি।

তারপর মেডিকেল রিলিফ— অনেক গ্রামে দেখছি যে হেল্‌থ সেন্টার খোলা হয়েছে, এই সমস্ত জায়গায় মাত্র ৩০ টাকায় মাসিক ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই ৩০ টাকার ঔষধে একটা ইউনিয়নের কিছুই হয় না। তারপর মেডিকেল রিলিফের এমন অবস্থা যে রামপুরহাটের একটা গ্রামে কলেরায় ৫০-৬০ জন লোক মারা গেল। সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসাররা চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে তিন মাসের মধ্যেও সেখানে লিম্প বা ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। অথচ শহরে যথেষ্ট মাইনে করা কর্মচারী রয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় হাসনাবাদে কলেরা আরম্ভ হল, সেখানে এমন অবস্থা হল যে লোকে ঘরে ঘরে মরে পড়ে আছে, কিন্তু তার কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেখানে যে সমস্ত হেল্‌থ অফিসার ছিলেন তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না। এইরকম ভাবে রুরাল রিলিফের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই দিকে বিশেষ করে নজর দেন না। তারপর আপনারা দেখছেন অন্য জিনিসের দাম কমে যাচ্ছে কিন্তু খাদ্যের দাম কমছে না। যে সমস্ত জিনিসের দাম কমে যাচ্ছে সেগুলি কিনবে কে? চাল দুবেলা তো পাওয়াই যায় না! বাড়িতে অর্দ্ধেক রুটি ও ভাত হয়। এই চালের

বদলে আটা খেয়ে গরিব জনসাধারণ কোনও রকমে জীবনধারণ করছে। আটা ও গমের দাম বেড়ে গেছে। এই যে ফুড প্রাইস বেড়ে গেছে তাতে দেশের লোকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যাতে দেশে খাদ্য উৎপাদন হয় এবং জনসাধারণ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

গভর্নমেন্ট যেটুকু সাহায্য দিচ্ছে, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি আনাচ্ছে তাতে যাতে কাজ হয় তা দেখা উচিত। চাষীদের যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া উচিত এবং যেটুকুও পেয়েছে তা যদি সময়মতো পেত এবং সকলে পেত, তাহলে খাদ্য আরও বেশি উৎপন্ন হত এবং দামও এতটা বাড়ত না। সেদিকেসরকারি দৃষ্টি মোটেই নেই এবং এই সরকার সেদিকে দৃষ্টিও দিচ্ছে না।

১৩ মার্চ, ১৯৫২।

মন্ত্রীরা হিসাব দেন না

মাননীয় স্পিকার মহোদয়,আমরা কোনও টাকা এই মন্ত্রীদের হাতে দিতে পারি না, কারণ আমাদের যে সমস্ত অভিযোগ তার কোনও উত্তর পাই না। তাঁরা টাকা খরচ করেন কিন্তু কোনও হিসাব আমাদের কাছে আগে দেখান না। পরে যখন দেখান তখন দেখি যে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। চারুবাবু দেখিয়েছেন যে রোড ট্রান্সপোর্টে ১৭ লক্ষ টাকা ডুবে গেছে। তার কোনও সন্তোষজনক এক্সপ্লানেশন দেননি। তারপর ডিপ সি ফিশে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজে খরচ হয়েছে। সেখানেও কোনও সুফল দেখি না। এ তো আর গৌরী সেনের টাকা নয়—জনসাধারণের টাকা। গরিব জনসাধারণের কাছে হেভি ট্যাক্স নিয়ে খরচ করছেন,সুতরাং হিসাব দিতে তাঁরা বাধ্য। কিন্তু সে উত্তর তাঁরা কোনও দিনই দেন না। তারপর আমাদের দেশে লবণ শিল্পটা খুব ভাল করে গড়া যায়। সে সম্বন্ধে ওঁরা ফ্রান্স থেকে নাকি এক্সপার্ট এনেছিলেন। তার বাবদ কত খরচ হল তাও কিছু জানালেন না। অপজিশন থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা বলেন,এ সব তো একঘেয়ে প্রশ্ন। কিন্তু ওঁরাও তো একঘেয়ে খরচ করছেন—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ডুবিয়ে দিচ্ছেন—তার কোনওই হিসাব দিচ্ছেন না।

তারপর, রামপুরহাটে ১৭ ফেব্রুয়ারি বসন্ত আরম্ভ হল। কিন্তু ১মার্চ পর্যন্ত কোনও খবরই নেই। সেখানে যখন পক্স হল তখন ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার বা এস ডি ও তাঁরা কী করছিলেন? ১ মার্চের রিপোর্টে হঠাৎ দেখা ষায় যে ৯ জন লোক মারা গেছে, ১৫ মার্চ রিপোর্টে দেখা গেল ৩২জন মারা গেছে। সরকারের পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও যদি সময়মতো রোগের কোনও প্রতিবিধান না হয়, তাহলে মেডিকেল বাবদ কেন টাকা দেওয়া হবে? জনসাধারণ যে ওঁদের টাকা দিচ্ছে—তাদের অভাব-অভিযোগ, খাওয়া-পরা, রোগশোকের ব্যাপারে যদি কোনও ব্যবস্থা ওঁরা না করেন তবে ওঁদের হাতে কেন টাকা দেওয়া হবে? তারপর কানাইবাবু যে বলেছেন বাঁকুড়ায় ১৫৬টা ডাকাতি হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১৭টা ডিটেক্টেড হয়েছে—যদি এই হয়, তবে পুলিশের খাতে যে টাকা নেন, নানারকম ভাবে পুলিশের উন্নতি করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে বলে বলেন, অথচ চুরি, বাটপাড়ি প্রভৃতি বেড়েই যায় তাহলে পুলিশের জন্য টাকা দিয়ে লাভ কী?

এই কিছুদিন আগে, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, রাত্রি নটার সময় শ্রী সিনেমার সামনে একটা মার্ডার হল। সে বিষয় কমিশনার অব পুলিশের নিকট চিঠি লিখে জানানো হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই রকম যদি অকর্মণ্য পুলিশ হয় তাহলে তাদের জন্য এত টাকা পয়সা এবং ফ্লান্ডিং দেওয়া উচিত নয়।

গত নির্বাচনের সময় মেদিনীপুরে একটা ঘটনা ঘটে। সেখানে একজন কংগ্রেস নেতা, তার আগে কতগুলি নির্বাচন হয়ে গিয়েছিল, বক্তৃতা দিয়ে বলেন যে আপনারা যাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন তাঁদের দেখে নেব। এবং তারপরই দেখা গেল যে সেখানকার কর্নেল জে সি দে-র বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে যায়। সেখানকার লোকেরা এই ঘটনা যখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান তখন তিনি ক্ষেপে উঠে বললেন যে আপনাদের যে অ্যারেস্ট করা হয়নি এই যথেষ্ট। তারপর সেখানকার এস ডি ও-র কাছে যে সমস্ত লোককে প্রোডিউস করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকায় তাদের ইনোসেন্ট বলে ছেড়ে দেওয়া হল। এই রকম যদি গভর্নমেন্টের পুলিশ হয় তাহলে কেন তাদের এত টাকা দেওয়া হবে?

তারপর রিহ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে সরকার এটা কোনও জায়গায়ই ঠিকভাবে করতে পারে নি। যে কোনও মন্ত্রী মহাশয় আমার সঙ্গে আসুন, আমি তাঁকে দেখিয়ে দেব যে এই রিহ্যাবিলিটেশন কোথাও কিছু হয় নি। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রিফিউজিদের জীবিকা অর্জনের পথের সুবিধা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রিহ্যাবিলিটেশন কিছুই হল না। যে কোনও রেফিউজি ক্যাম্পে যান সেখানে দেখতে পাবেন যে লোকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই যে এদের সামান্য করে লোন দেওয়া হয়, প্রথমে ১০০ টাকা তারপর আবার তিন মাস বাদে ১০০ টাকা দেওয়া হয়, এতে তাদের কিছু সুবিধা হয় না, তারা সমস্তই খরচ করে ফেলে। এর চেয়ে যদি তাদের একবারে ৫০০ টাকা দেওয়া যায় তাহলে হয়ত এরা তার দ্বারা কিছু সুবিধা করে নিতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রিহ্যাবিলিটেশন ঠিকমতো হচ্ছে না। মালদাতে কিছু রিফিউজিকে মন্ত্রী মহাশয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে বসানো হয় এবং তাদের রাখা হয় সেই সমস্ত মুসলমানদের ভ্যাকেন্ট হাউসে। তারপর যখন এই সমস্ত মুসলমান চাষীভাইরা ফিরে এল তখন তাদের জন্য চাষ এবং থাকার কোনও ব্যবস্থাই করা হল না। আর যাও একটু মাত্র করা হয়েছে, তাও এমন জায়গায় তাদের বসানো হয়েছে যে সেখানে প্রায় ৫/৬ হাত করে জল। তাহলে রিহ্যালিবিটেশন হল কী করে? মালদায় প্রায় ৫০ লক্ষ রিফিউজি রয়েছে। এই রিফিউজিদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে তাদের মুসলমানদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এই নোটিশ দেওয়ার আগে এই সমস্ত রিফিউজিদের জন্য অন্য কোনও জায়গার ব্যবস্থা করেনি। আমরা চারিদিক থেকে খবর পাচ্ছি যে এই সমস্ত রিফিউজিরা একটা আবেদনপত্র পেশ করেছিল। কিন্তু সরকার এবিষয়ে কোনও ডেফিনিট পলিসি ঠিক করেনি যে তারা কোথায় যাবে।

সেদিনও বলেছি, আজও বলছি যে, কলকাতায় বহু লোক বস্তিতে বাস করে। জমিদাররা এই সমস্ত বস্তিবাসীদের নোটিশ দিয়ে তাদের উৎখাত করার চেষ্টা

করছে। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? এই বস্তি সম্পর্কে যে সমস্ত আইন হয়েছে তাতে বড়লোকদেরই বেশি সুবিধা হয়। তারা টাকা পয়সা খরচ করতে পারে না বলে কোর্টেও যেতে পারে না। বড় লোকেরা হয়তো এদের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করতে পারেন, কিন্তু গরিব লোকেরা কোর্টে গিয়ে টাকা পয়সা খরচ করে কী করে ইনজাংশন আনতে পারে? তাই দেখা যাচ্ছে যে বস্তিবাসীদের এতে মোটেই সুবিধা হচ্ছে না। পূর্বে যখন ঠিকা টেনেন্সি বিল হয় তখন আমরা বলেছিলাম যে এদের একটা স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হোক, তাহলে জমিদাররা তাদের ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করতে পাবরে না। তারপর হেলেঞ্চা ক্যাম্পের লোকদের ১৫ বিঘা করে জমি দেওয়ার কথা ছিল,কিন্তু তা তারা পায়নি। এর জন্য সেখানে অনেকেই হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে। মধ্যমগ্রামে একটা স্বদেশনগর বাস্তুহারা মঙ্গল সমিতির কলোনি, সরকারি রিফিউজি ক্যাম্প আছে। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজাব রিফিউজি রয়েছে। শুনলাম সেখানেও নাকি সম্প্রতি হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে। এইরকমভাবে সরকারের রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্ক চলছে।

তারপর কোনও অফিসার কোনও ব্যাপার ঘটলে,ছোট ছোট যে সমস্ত কর্মচারী আছে তারা যদি সামান্য একটু দোষ করে তাহলেই তাকে তখনই ডিসমিস করা হয়। তাদের সম্বন্ধে কোনও সুবিচার নেই। বড় বড় অফিসাররা ফাইলে যা লেখেন তাই মন্ত্রী মহাশয়রা মেনে নেন। সরকার বলে থাকে যে তারা জনসাধারণের জন্যই। যদি তাই হয়, তবে জনসাধারণ যখন একটা রিপ্রেজেন্টেশন করে সরকারের কাছে তখন তাদের কথা না শুনে অফিসাররা ফাইলে যা লেখে তাই নিয়ে বিচার করে। এই সরকারের দ্বারা যদি আমাদের কোনও সুবিধাই না হয় তাহলে তাদের কেন টাকা দেব? সেই জন্য আমি এই অ্যাপ্রোসিয়েশন বিলের বিরোধিতা করছি।

১৯ মার্চ, ১৯৫২।

নেতাজীর সংগৃহীত অর্থ কোথায় গেল?

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে গত অ্যাসেম্বলিতে অনেক আলোচনা হয়েছে। নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক রকম সংবাদ আমরা শুনেছি। এই অ্যাসেম্বলিতে গত অধিবেশনে এই সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা ভারত সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছিল। তার উত্তরে ভারত সরকার জানিয়েছে, তাদের বিশ্বাস নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বাইরে কীভাবে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট কীভাবে ভারতের বাইরে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। এবং সেই আজাদ হিন্দ বাহিনী এমন কি ইম্ফলে পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতের জমি পর্যন্ত এসেছিল। সেই আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট পরিচালনার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণ কোটি কোটি টাকা নেতাজীর হাতে ন্যস্ত করেছিল। আমরা বহুবার সংবাদপত্রে দেখেছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাঁর হাতে বা তাঁর গভর্নমেন্টের হাতে যে টাকা সেখানকার জনসাধারণ দিয়েছিল সেই সমস্ত টাকা খরচ হয়নি এবং তার অনেক টাকা আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের কাছে ছিল। সেই টাকা ভারতবর্ষ বা ভারত গভর্নমেন্ট দাবি করতে পারে, কারণ সেই টাকা আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেন্টের টাকা এবং সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার টাকা। কাজেই সেই দিক থেকে সেই টাকার কী হল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার অধিকার আমাদের আছে, ভারত গভর্নমেন্টের আছে। সেই টাকার অনুসন্ধান করে সেই টাকা যদি আমরা পাই ,তাহলে সেই টাকা দিয়ে আমরা অনেক ভাল কাজ করতে পারব, অন্তত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের "মহাজাতি সদন" যা তিনি পরিচালনা করে গেছেন তাতে সেই টাকা লাগাতে পারব। ১৯৪৫ সালে ১৭ই আগস্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্র সায়গন থেকে চলে যাবার পরে যে এরোপ্লেন দুর্ঘটনা হয় তারপর অনেক অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমরা তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। সেই দুর্ঘটনাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে , এটাই জনরব । যদিও তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকবার অনেক রকম কথা ও সংবাদ পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন তিনি গুলিতে মারা যান, ম্যাকআর্থার গুলি করে মেরেছেন। কেউ বলেন তাঁকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছে। আর দেখা যায় যে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল যখন টোকিও গিয়েছিলেন তখন তিনি নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জেনারেল ম্যাকআর্থার বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র আমাদের প্রধান শত্রু। তারপর ডাঃ রাধাবিনোদ পাল যখন বলেন তিনি তো এখন নেই, তখন জেনারেল ম্যাকআর্থার কোনও উত্তর দেননি। যাই হোক,

আজ যা আলোচনার বিষয় সেটা হল অর্থ বা টাকার ব্যাপার। সংবাদপত্রে আমরা দেখি যে, যখন তিনি সায়গন ত্যাগ করেন এরোপ্লেনে করে তখন তাঁর সঙ্গে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের মন্ত্রী এবং বড় বড় সামরিক কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি যাবার সময় একজন জাপানি জেনারেল—নাম তাঁর যোশিদা—তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। কিন্তু আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি যে সেই প্লেনটা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তাঁকে সেখান থেকে অন্য এরোপ্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ২৪শে আগস্ট আমরা রেডিও থেকে এবং সংবাদপত্রে জানলাম তিনি এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

আমরা জানি আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের অনেক টাকা ও সোনা ছিল। সে টাকা কোথায় যাবে, কে নিয়ে যাবে? সেদিন নেতাজীর সঙ্গে মন্ত্রী ও সামরিক কর্মচারীদের যাবার কথা ছিল। কিন্তু প্লেনে জায়গা না থাকায় নেওয়া হয়নি। একমাত্র কর্নেল হবিবুর রহমান তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। এরোপ্লেনে বহু টাকা এবং সোনা ভর্তি বাক্স প্রেরিত হয়। পরে শোনা যায় যে সে টাকা টোকিও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৪ তারিখে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হবার পর মিঃ এস এম আয়ার—তিনি আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী—তাঁকে টোকিও নিয়ে যাওয়া হয় এবং যতদূর খবর পাওয়া গেছে , সেই টাকা সঙ্গে যায়। সেই টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে বা কোথায় গেল তার কোনও সন্ধান পাওয়া নাগেলেও—সেই টাকা একজন ভারতীয়—তাঁর নাম মিঃ রামমূর্তি—তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। দেখা গেল সেই মিঃ রামমূর্তি রাতারাতি একজন মহা ধনী হয়ে গেলেন। এই মিঃ রামমূর্তি এখন ভারতবর্ষেই আছেন।

কাজেই টাকার সঙ্গে যাঁরা জড়িত—টাকা যা টোকিওতে গেছে—মিঃ আয়ার কিছু জানেন, মিঃ রামমূর্তি কিছু জানেন এবং সেখানকার ইন্ডিয়ান এনভয়—তিনিও জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ভারত গভর্নমেন্ট সেই টাকার অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করেনি। এই টাকা ভারতবাসীর টাকা। ভারতবর্ষে প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট বলে স্বাধীন গভর্নমেন্ট সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য। এবং আপনারা সকলেই স্বীকার করেছেন যে ব্রিটিশ শাসনের হঠাৎ অবসানের যে কারণ তা হল, আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট যেভাবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে লড়াই করেছিল, যেভাবে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের অফিসারদের বিচার করার সময় ভারতের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল—বিশেষ করে আর আই এনের বিদ্রোহ—তার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। তাই সেই গভর্নমেন্টের যে টাকা বা অর্থ ছিল—সেই কোটি কোটি টাকা, আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিল, সেই টাকা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার অধিকার আমাদের আছে।

নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্ট বলেছে যে, তাদের বিশ্বাস যে তিনি নেই। যদিও সেভাবে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চয়ই ভারত গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাদের যে ধারণা, বা যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের কারণ কী? কারণ ভারতবর্ষে এইরকম বহু লোক আছে—যারা তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম কনফ্লিক্‌টিং সংবাদ দিচ্ছে—যাতে করে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা না যায়। কাজেই ভারত গভর্নমেন্টের পরিষ্কার করে বলা উচিত যে কী কী কারণে, কীভাবে তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন এবং কী উপায়ে তাঁরা এটা জানতে পেরেছেন। কারণ আমরা দেখছি,নানারকম সংবাদ নানা দিক থেকে পাচ্ছি যে তিনি মারা যাননি— বেঁচে আছেন। এই রকম সংবাদ বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে। যাহোক, এদিক থেকে ভারত গভর্নমেন্টের উচিত জনসাধারণকে তাদের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যগুলি জানানো। সেই সঙ্গে এই অর্থ—এই যে ৩/৪ বাক্স ভর্তি সোনা সেই বম্বারে তুলে দেওয়া হয়েছিল—সে টাকা কোথায় গেল? সেই টাকাগুলির সন্ধান করতে গেলে অনেক রহস্যই বেরিয়ে যাবে। সেই জন্য আমি প্রস্তাব এনেছি, এই অর্থ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্ট বিশেষ অনুসন্ধান করুক। কারণ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছিল তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এবং যখন আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন, যাঁর তাঁদের মন্ত্রী বা বিশ্বস্ত কর্মচারী হয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই যখন এই রকম সংবাদ এসেছে তখন আমাদের নিশ্চয়ই এটা অনুসন্ধান করা দরকার। সেই অর্থ আমাদের —আমাদের দেশের জনসাধারণ তাদের সর্বস্ব দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য— সেই অর্থ অপব্যয়িত হবে, সেই অর্থ যথেচ্ছ খরচ হবে, সেটা ভারতবাসী ও আমরা সহ্য করতে পারি না। এই পবিত্র অর্থ দেশের ভাল কাজে লাগুক। সেইজন্য এই অর্থের অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেইজন্যই আমাদের প্রধান কর্তব্য হিসাবে এই প্রস্তাব আপনাদের কাছে এনেছি। আশা করি, এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করবেন।

৪ মে, ১৯৫৩।

প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নে

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এই প্রস্তাব হচ্ছে আমাদের সকল দলের প্রস্তাব। যদিও তিনি প্রথমে এই রকম কোনও প্রস্তাব আনতে চাননি তথাপি শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিকের অবস্থা দেখে এবং তিনি যে দাবির জন্য জীবনপণ করে লড়াই করছেন, সে দাবির দিকে দৃষ্টি রেখে অ্যাসেম্বলি সেশনের শেষ মুহূর্তে এই প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কংগ্রেসের বরাবর এই দাবি ছিল—জয়পুর কংগ্রেসও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশগুলি পুনর্গঠন করা হবে। গত অধিবেশনেও গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য বিশেষ করে এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত আমাদের সকলের সেই একই মত আছে। এই যে আছে— "That in order to arrive at a solution of linguistic and administrative problems--"

এদিক থেকে আমি মনে করি আমরা সকলেই এটা সমর্থন করতে পারি। বাংলাদেশের আশপাশে যে সমস্ত স্থান আছে সেই সমস্ত স্থান বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্ত করার জন্য বহুদিন ধরে আন্দোলন চলে আসছে এবং বিহারের অন্তর্গত মানভূমের জনসংঘের নেতা শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ এই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। তিনি ফ্যাক্টস্ অ্যান্ড ফিগারস দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের আশপাশে যে সমস্ত জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা খুব বেশি, কাজেই সেদিক থেকে সেগুলি বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সেইজন্য আমি আর সেবিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

আজ আমাদের সামনে যে প্রশ্ন, সেটাই আমি আলোচনা করছি। কিছুদিন আগে পণ্ডিত নেহরু একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে অন্ধ্রে যে রাষ্ট্র গঠিত হবে এক বৎসরের কাজ দেখে বাউন্ডারি কমিশন নিয়োগ করা হবে কিনা তা স্থির করা হবে। অন্ধ্রতে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর তার কার্যকলাপ দেখে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করবেন এটাই যদি তাঁর মনের কথা হয় তাহলে বলব, তিনি আমাদের এই দাবিটাকে ছোট করে দেখছেন। শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিকের সঙ্কটময় অবস্থা দেখে এই মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আর তাঁর কথা ছেড়ে দিলেও যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই সমস্যার সমাধানকল্পে

বাউন্ডারি কমিশন নিযুক্ত করা দরকার মনে করেন তাহলে এতে আর কাল হরণ করা উচিত নয়। বিশেষ করে শ্রীভৌমিকের অবস্থা দেখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে শীঘ্র বাউন্ডারি কমিশন নিয়োগ করবার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

এ বিষয়ে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন চলছে, অবশ্য বিরুদ্ধ মতবাদও আছে। অনেককে এই কথা বলতে শোনা যায় এতে নাকি প্রাদেশিকতায় উস্কানি দেওয়া হবে এবং এতে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে। এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি। যদি অন্যায়ভাবে কেউ ওই রকম কথা বলেন তাহলে সেটা মেনে নিলে অন্যায় হবে। সেই জন্য আমি মনে করি আমাদের এই অ্যাসেম্বলিতে থেকে পন্ডিত নেহরুর ওপর চাপ দিতে হবে বাউন্ডারি কমিশন নিয়োগের জন্য যাতে করে শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিককে আমরা অনশন ভঙ্গে রাজি করাতে পারি। আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় যাতে ভারতবর্ষে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি জেগে ওঠে তার জন্য আমাদের এক লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলতে হবে। এতে বিহারি ভাইদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনও কথাই উঠতে পারে না। আমরা সকলে এক সঙ্গে ব্রিটিশ আমলে লড়াই করেছি—একই উদ্দেশ্যে একই প্রস্তাব নিয়ে লড়াই করেছি। আগামী ১২ তারিখে বিহার অ্যাসেম্বলিতে আমাদের এই প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। আমরা আশা করব বিহারি ভাইরা আমাদের এই প্রস্তাব সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন, বিশেষ করে এইজন্য যে, বিহার এবং বাংলা একই কংগ্রেস সরকারের অন্তর্ভুক্ত। আজ আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে যাতে বিহারি এবং বাঙালির মধ্যে কোনও রকম অনৈক্য গড়ে না ওঠে।

কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এটাই বাংলাদেশে ও বিহারের কর্তব্য যাতে বাংলা ও বিহার এই দুটি প্রদেশের মধ্যে অনৈক্য বেড়ে না ওঠে এবং সেটা চেষ্টা করতে হবে। ভাষার ভিত্তিতে যে দাবি আছে সেটা মেনে নিতে হবে এবং এটা যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে ভারতবর্ষ দুর্বল হবে না, বরং আরও শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভাষা বা বিশেষ কোনও ব্যাপার নিয়ে যদি মতানৈক্য থাকে তাহলে ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষকে একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বিপ্লবী দলগুলি লড়েছে এবং সেজন্য যতরকম ত্যাগ স্বীকার করা দরকার তা করেছে। সেজন্য ভারতবর্ষের একমাত্র আদর্শ হবে যে শোষণের ব্যবস্থা থাকবে না, উৎপীড়নের ব্যবস্থা থাকবে না, সমাজের মধ্যে এমন কোনও ব্যবস্থা থাকবে না যাতে এক শ্রেণী অন্য মানুষকে নির্যাতন করতে পারবে, শোষণ করতে পারবে। যদি তা থাকে তাহলে ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে

পড়বে। কাজেই এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাঁর আত্মমর্যাদা নিয়ে, অধিকার নিয়ে এই রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে।

আমরা শুনি, এক সময় শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হবে। এরকম মতবাদও আছে। ভারতবর্ষে যাতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অধিকার নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেইরকম রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে এবং তাহলেই ভারতবর্ষে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে যে সমাজে কোনও নির্যাতন, উৎপীড়ন, শোষণ থাকবে না। সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই লিঙ্গুয়িস্টিক বেসিসে প্রদেশ গঠন করতে হবে। এজন্য আজ যদি বাংলা ও বিহারের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকেও তাহলেও এটা মেনে নিলে ভারতবর্ষে শক্তিশালী, শোষণহীন, ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে। এই বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

৭ মে, ১৯৫৩।

শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

'অ্যাসেম্বলি'তে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করি যে শিক্ষকদের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্যে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু তিনি তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেননি এবং তাঁদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবেচনা করেননি। শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে বরাবরই আন্দোলন করেছেন, কনফারেন্স করেছেন, কিন্তু গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন রয়েছে। তাঁরা 'সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড' মারফৎ তাঁদের দাবি জানিয়েছেন,. এটা তাঁদেরই 'কনস্টিটুয়েন্ট বডি'। সুতরাং এর রেকমেন্ডশন যে গভর্নমেন্ট মেনে নেবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ডাঃ রায়ের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হল না। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড'-এর প্রস্তাব একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানেরই প্রস্তাব। তার প্রস্তাব যদি সরকার মেনে নিত তাহলে এই রকম গোলমালের সৃষ্টি হত না। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, শিক্ষকেরা যখন কোনও মতেই সরকারকে দিয়ে সেই প্রস্তাব মানাতে পারলেন না, তখন বাধ্য হলেন এমন কোনও কাজ করতে, অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে সরকার তাঁদের দুঃখ বোঝে, যাতে সরকারের মনকে তাঁরা প্রভাবিত করতে পারেন, জনমতকে সরকার মেনে নিতে এগিয়ে আসে। তাই তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ডালহৌসি স্কোয়ারে স্কোয়াটিং আরম্ভ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রসেশন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁরা ইটপাটকেল ছোড়েননি, দিনের পর দিন ৫ দিন ধরে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ডালহৌসি স্কোয়ারে স্কোয়াট করেছিলেন। কিন্তু যখন কোনও মতেই সরকার রাজি হল না তখন তাঁরা স্থির করেন যে চারজন করে শান্তিপূর্ণভাবে আইনভঙ্গ করবেন। যখন তাঁদের সকল আবেদন নিবেদন গভর্নমেন্টের কাছে ব্যর্থ হল তখনই কেবল তাঁরা আইনভঙ্গ করতে উদ্যত হলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলে থাকেন, যদি এরকম কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে সেই অভিযোগ উপস্থিত করার জন্য। কিন্তু সেই অভিযোগ উপস্থিত করলে এবং যদি সেই বিষয়ে কোনও সামাধানের চেষ্টা না হয় এবং সেই অভিযোগ যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তখন জনসাধারণ কোন পথে যাবে? কাজেই শিক্ষকরা আইনানুসারে চারজন চারজন করে যদি তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি জানাবার জন্য আইনভঙ্গ করেন তবে সেটা তাঁরা সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যই করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অবস্থাটা ঘটে গিয়েছে সে অবস্থার ফলে আজকে যে এতগুলি লোক মারা গেল, কয়েকশত লোক বন্দি হল এবং আজ চতুর্দিকে যে

একটা অসন্তোষের মনোভাব দেখা দিয়েছে এর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্পিকার মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৫২ সালে আমরা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম তখন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও পরে তিনি সেই ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি যদি সেই দাবি আগেই মেনে নিতেন তাহলে ১৯৫২ সালে খাদ্য আন্দোলন হত না। তিনি বলেছিলেন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। যে আগুন চারিদিকে জ্বলছিল তাতে তারই হাত পুড়েছিল এবং ৭ দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখানেও শিক্ষক মহাশয়দের দাবি অতি সঙ্গত দাবি, প্রত্যেক বছরে রেভিন্যু খাতে খরচা বেড়েই যাচ্ছে। এই ইলপেড টিচারদের জন্য আরও এক কোটিই না হয় বাড়ত, যদি তাদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তা হল না। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট অপব্যয় হচ্ছে, কিন্তু এই দুঃস্থ শিক্ষকদের মাইনে যদি সামান্য বাড়িয়ে দেওয়া হত সেটা সম্পূর্ণ সঙ্গত হত। সেদিন ১৬ তারিখে যে কনসেশন তিনি ঘোষণা করেছেন সেটা একটু বিলম্বে হয়েছে। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন প্রসেশন বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা আগে করলে কী ক্ষতি হত? এখনও সময় আছে। যদি সময় থাকতে তিনি সমস্ত শিক্ষকদের এবং তাঁদের সঙ্গে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের ছেড়ে দেন তাহলে আমি মনে করি সহজেই ব্যাপারটার সমাধান হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমরা বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে এই বাজেট আলোচনা করছি। সম্প্রতি শিক্ষকদের ধর্মঘট নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে এই অ্যাসেম্বলির কয়েকজন সদস্য জেলে আটক আছেন এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে এই বাজেট আলোচনা হচ্ছে। এই বাজেট সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঘাটতি ছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে এবং সংশোধিত হিসাবে ঘাটতি ছিল ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। এই ভাবে ঘাটতি চলছে এবং এরকমভাবে ১লা এপ্রিলে যে বাজেট আরম্ভ হবে সেখানে আয় হবে ৩৯,৯৩,২২,০০০ টাকা আর খরচ হবে ৫৩,৩০,৭৬,০০০ টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগামী বৎসরে ১৩,৩৭,৫৪,০০০ টাকা ঘাটতি হবে। এভাবে যে বিভিন্ন খাতে ঘাটতি বেড়ে চলেছে, তাতে এই বাজেটকে নৈরাশ্যজনক বলেই মনে হয়। এই দুবছরে ২৫ কোটি টাকা ঘাটতি পড়বে। এরকমভাবে যদি ঘাটতি বাড়ে তাহলে যে গভর্নমেন্টের ওপর জনসাধারণ আস্থা হারিয়েছে সেই গভর্নমেন্ট চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। ভারত গভর্নমেন্ট ১৯৫১-৫২ সালে ১,৫৬,২০,০০০ টাকা ধার দিয়েছিল লোন বাবদ আর ফিনান্স করপোরেশন চলতি বছরে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে রেকমেন্ড করেছে ২,৫৫,৯২,০০০ টাকা। আগামী বৎসরে ৩,০৫,৪১,০০০ টাকা নিয়েও বাজেটের ঘাটতি পূরণ হবে না। ঘাটতি বরাবর বেড়েই যাবে। যদি এই বিপুল ঘাটতি জনকল্যাণের জন্য হত, শ্রমিক কল্যাণে মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা সমাধানে বা নতুন নতুন শিল্প ব্যবস্থা উন্নতির জন্য খরচ হত তাহলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঘাটতি যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে সেই অনুপাতে জনকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নেই। আগামী বৎসরে যে ১,১১,০০,০০০ টাকা বেশি খরচ হবে সেই খরচ ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আদায় করা হবে। ভারত গভর্নমেন্ট যদি এই টাকা দেয় তাহলেই এই খরচ চলবে।

কৃষিখাতে ১৪ লক্ষ টাকা কম ধরা হয়েছে। এভাবে যদি কৃষি কাজ থেকে টাকা বাদ দেওয়া হয় তাহলে কৃষির উন্নতি হবে না এবং দেশের কল্যাণও হবে না। সেদিক থেকে মনে হয় কৃষিখাতে খুব কম ধরা হয়েছে। সবচেয়ে লোকসান হচ্ছে স্টেট ট্রান্সপোর্টে। আগামী বৎসর ১২,৪৮,০০০ টাকা, আর এ বছর নিয়ে সবশুদ্ধ ২২, ৯৭,০০০ টাকা ক্ষতি হবে। এই স্টেট বাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে সম্পূর্ণভাবে যে অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শিক্ষা বিভাগে ১,৬৬,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলে যে ৩০,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা হচ্ছে তারই জন্য সম্ভবতঃ এই ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। তবে কিছু লোকের চাকুরি হবে। একটা প্ল্যানিং না করে কিছু হবে না। সমগ্র বাংলা দেশে যে সমস্ত বেকার আছে তারা সকলেই যাতে চাকুরি বা কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু কিছু মাস্টার নিয়োগ করলে বা ৮,০০০ লোককে চাকুরি দিলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না, বরং সমস্যা আরও বাড়বে।

স্বাস্থ্য খাতে এবার ১৪ লক্ষ টাকা কম ধরা হয়েছে, কৃষি বিভাগে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা কম ধরা হয়েছে। এদিকে রোগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যক্ষ্মা সম্বন্ধে গভর্নর তাঁর ভাষণে যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে এই যে যক্ষ্মা প্রতিরোধ যুদ্ধনীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। যে কোনও উপায়ে এই যক্ষ্মাকে দমন করতেই হবে। কিন্তু তার ব্যবস্থা না করে স্বাস্থ্য বিভাগে টাকা কম ধরা হয়েছে।

তারপর শিল্পের জন্য মাত্র ৩৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই ৩৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় শিল্পের উন্নতি হতে পারে না এবং এতে করে বেকার সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না। আর শিল্প যদি প্রসার লাভ না করে তাহলে বেকার সমস্যারও সমাধান হবে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন কুটিরশিল্প প্রসারের কথা। কুটিরশিল্প কী সেটা খুব ভাল করে জানতে হবে। কুটিরশিল্প ও মিল কারখানায় যদি প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে কীভাবে কুটিরশিল্প গড়ে উঠবে? মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তা হবে না। উভয়ের সঙ্গে সমতা থাকবে, এই রকম কোনও প্ল্যান না নিলে কুটিরশিল্পের উন্নতি হবে না। শুধু 'কুটিরশিল্প, কুটিরশিল্প' মুখে বললেই কাজ হবে না।

তারপর পুলিশ বিভাগে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সে সম্বন্ধে বলার আগে আপনারা সকলেই জানেন, জনসাধারণের ওপর পুলিশের অযথা কিরকম অত্যাচার হয়। যেভাবে শিক্ষক আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন এবং খাদ্য আন্দোলনে পুলিশ জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার করেছে তা আপনারা সবাই দেখেছেন। সেদিন যতীন চক্রবর্তী ১৩ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর জেলে আটক ছিল। সে জেল থেকে বেরবার আগে থেকে কলকাতার পুলিশ তার বাড়িতে ওয়ারেন্ট করে রেখেছিল। সে এখানে ছিল কি ছিল না, সে খবর না নিয়েই তাকে ধরা হয়েছিল। তাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম শিক্ষক আন্দোলনে যেভাবে লোককে ধরা হয়েছে এবং যে ভাবে চার্জ দিয়ে লোকদের আটকানো হয়েছে সেই সব ব্যাপার দেখেই বুঝতে পারা যায় কীভাবে পুলিশ মিথ্যা অজুহাতে লোকদের ধরে মিথ্যা আটক করে। জ্যোতিবাবু যে বলেছেন সেইটেই হচ্ছে ফ্যাক্ট—যে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে লোক ছাড়ান পায়।

তারপর ফেমিন। যদিও বাম্পার ক্রপ হয়েছে বলে ওঁরা বলছেন, কিন্তু রেশনের নিয়ম অনুসারে ধরা হয়েছে ৪০ লক্ষ টন। কিন্তু আমাদের দরকার আরও বেশি এবং সে অনুপাতে বাম্পার ক্রপ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের আয়ত্ত মতো দামে চাল যথেষ্ট সরবরাহ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাম্পার ক্রপ বলে কোনও লাভ হবে না। গত বৎসরও বাজেটের পূর্বে এই ফেমিন সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট অবহেলা করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল ফেমিন হল। পূর্বে বাম্পার ক্রপ বলা হলেও পরে আবার টাকা ধরতে হল।

গভর্নমেন্ট প্রায় ১৪টা স্কিম ধরেছে। এর মধ্যে ১১টা স্কিমই লুজিং কনসার্ন। যেমন স্টেট ট্রান্সপোর্ট। এই কনসার্নে লস যাওয়ার প্রধান কারণ আর কিছু নয় কেবল ব্যাড ও ইনএফিসিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট। গভর্নমেন্টের বাইরে প্রাইভেট যে সমস্ত আন্ডারটেকিং আছে সেগুলি তো বেশ সাকসেসফুল হচ্ছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের যে সব আন্ডারটেকিং সে সমস্তই লুজিং কনসার্ন।

ডাঃ রায়ের প্রায় সব ব্যবসাই লুজিং কনসার্ন। কেবল গভর্নমেন্টের বাইরে যেগুলি প্রাইভেট বিজনেস আন্ডারটেকিং অর্থাৎ যেগুলি তার ব্যক্তিগত সেখানে ডাঃ রায় সাকসেসফুল বিজনেসম্যান। কেবল বারাকপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ডিস্ট্রিবিউসন অফ মিল্ক ইন কোচবিহার এই রকমের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সবই তাঁর লুজিং কনসার্ন।

তারপর দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, সেটা আমরা অনেকেই দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে যেভাবে কাজ হচ্ছে তা দেখলে অবশ্যই আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও না বলে পারা যায় না, যে কাজ সেখানে হচ্ছে তার দ্বারা কি পরিমাণ জনকল্যাণ হবে সেটা এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে একটা কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে সমস্ত লোকের জমি ও বাড়ি নেওয়া হয়েছে তার বদলে তাদের যে দর দেওয়া হয়েছে তা সন্তোষজনক হয়নি। তাদের সেই সব ঘরে জল পড়ে এবং তারা যে জমি পেয়েছে সে জমি চাষের উপযোগী নয়। তারা বহুকাল ধরে পরিশ্রম করে যে জমি নিজেরা তৈরি করেছিল, তার বদলে এখন তাদের যে জমি দেওয়া হয়েছে, তাতে ফসল হয় না। আর ঘরগুলি দেখতে যদিও চকচকে, কিন্তু তা দিয়ে জল পড়ে। তাদের সামনে অফিসারদের ঘরগুলি এত সুন্দর যে দেখা মাত্রই পার্থক্যটা চোখে পড়ে। তিলুয়ায় আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক চাষী এসে আমাদের জানিয়েছে যে তারা এখনও তাদের জমির দাম পায়নি। এই হচ্ছে অবস্থা। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে ৩৬ কোটি টাকা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু সেখানে তারা কী ভাবে কাজ চালাবে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলতে পারি না।

তারপর কল্যাণীতে ৫ হাজার প্লটের একটা শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে মাত্র ৯০০ প্লট বিক্রয় হয়েছে। কল্যাণীতে যে টাকা খরচ হয়েছে, যদি সেখানে সেটা খরচ না করে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টে টাকা খরচ করা হত তাহলে কল্যাণীতে যে অপব্যয় হয়েছে সেটা আর হত না, অথচ দেশে নতুন ইন্ডাস্ট্রি হত। আর একটা হচ্ছে সোনারপুর স্কিম। সেটায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের অনেকখানি চেষ্টা হয়েছে, অনেকখানি খাদ্যের পরিমাণও হয়ত বেড়েছে, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ যতখানি বাড়লে দেশে প্রাচুর্য্য হয় তা হয়নি এবং সে প্রাচুর্য না হওয়া পর্যন্ত দেশের কল্যাণ হবে না। এইসব দিক আলোচনা করে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই বাজেট সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক, এর দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে না এবং এতে করে দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

বন্দিদের মুক্তি চাই

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ট্রামভাড়া আন্দোলনের সময় প্রায় ১৬০০ রাজনৈতিক বন্দিকে জেলে আটকানো হয়েছিল এবং ডাঃ রায় তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন যে এই ১৬০০ বন্দির মধ্যে ৬০০কে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ৯০০ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করা হবে। আমি জানি না, সেই ৬০০কে ছাড়া হয়েছিল কিনা। বাকি যে ৯০০ তাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত মামলা বিভিন্ন কোর্টে আনা হয়েছে বা দায়ের করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলি যে ভূয়া সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এক জায়গায় যারা সব মিটিং করছিল হঠাৎ পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদের ধরে নিয়ে এল। এইভাবে ওই ৯০০ লোকের অধিকাংশকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে আটক করা হয়েছে।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের কেস এই সম্প্রতি হয়েছে। হঠাৎ ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর তাঁকে কোনও মতেই বেল দেওয়া হয় না। পরে ৭,০০০ টাকার জামিনে তিনি জেলের বাইরে আসেন এবং দু'দিন পরেই তিনি সম্পূর্ণ মুক্তি পান। যতীন চক্রবর্ত্তীর কথা এর পূর্বে বলেছি, তিনি কৃষ্ণনগর জেলে ছিলেন এবং সেখানে থেকে ফিরে আসার পূর্বে থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করা ছিল এবং তিনি এখানে আসা মাত্র গ্রেপ্তার হন। যা হোক তাঁর ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রীর কানে যায় এবং তিনি মুক্তি পান। আমার বিশ্বাস সেই ৯০০ বন্দির অধিকাংশের কেসই এই রকম। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে কতগুলি কেস এখনও কোর্টে রয়েছে। এর মানে হচ্ছে, পুলিশ যে ভাবে লোকদের ধরে বা গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে ঠিক চার্জশিট দিয়ে কোর্টের সামনে হাজির করতে পারছে না। এই জন্য দিনের পর দিন তারা মামলা স্থগিত রাখে এবং সাধারণ লোকদের অযথা হ্যারাস করা হয়। এইরকমভাবে শিক্ষকদের ব্যাপারটা যখন মিটে গেল তখন উচিত সেই সম্পর্কে যাদের ধরা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া। আর সকলকে যদি না ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে যাদের আটক রাখা হয়েছে তাদের ফাইল তাড়াতাড়ি দেখে যাতে শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ দেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে আছে। শিক্ষকদের কেস মিটমাট হবার পরও পুলিশ নানা অজুহাতে এখনও যদি সংশ্লিষ্ট বন্দিদের আটক রেখে দেয়, তাহলে সেই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

আপনারা জানেন আজ দেশের মধ্যে এই রকম কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা কোনও একটা সুযোগ পেলেই গোলমাল বাঁধিয়ে লুটপাট শুরু করে দেয়।

যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন বা শিক্ষক আন্দোলন করেছেন তাঁদের সঙ্গে এঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। দেশময় যে বেকার সমস্যা রয়েছে, চারদিকে যে সমস্ত লোক আজ কাজ পাচ্ছে না, কাজের অভাবে "এম্পটি ব্রেন ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ"— এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, কিছু সংখ্যক এই রকম লোক সৃষ্টি হচ্ছে এর জন্য সরকারি নীতিই কতকটা দায়ী এবং বেকারসমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি না দিলে এই অবস্থা হবে। আর শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুর কেস। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল, কিন্তু তিনি স্পিকার মহাশয়ের কাছে প্রটেকশন দাবি করেন, তাঁর প্রটেকশনে এখানে আটক ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এই শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের মিটমাটের ব্যাপারে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন। সেই মিটমাটের পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করাটা একটা ভিন্ডিকটিভ মেজার ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি মিটমাট না হত তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করার কারণ ছিল। এই রকমভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গভর্নমেন্ট অন্যায় এবং অগণতান্ত্রিক কাজ করেছে। তারপর শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জী ও শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ আজও জেলে আছেন। বাইরে মিটমাট হয়ে গেল, অথচ আজও তাঁদের এই রকমভাবে আটক রাখার কী কারণ? যখন কোনও একটা আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের মূলে কোনও একটা আইনভঙ্গ হতে পারে, কিন্তু যখন সেই আন্দোলনের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যায় তখন সংশ্লিষ্ট সকল বন্দিকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। ডাঃ রায় এর আগে প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "রিলিজ ইজ আন্ডার অ্যাক্টিভ কনসিডারেশন—"।

আমি সেইজন্য এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তিনি যেন এই সমস্ত বন্দিদের অচিরে মুক্ত করে দেন। তাহলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে একটা অসন্তোষ রয়েছে তা আর বৃদ্ধি পাবে না। সরকার যদি তাদের নীতির পরিবর্তন করে এই সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দেয়, তাহলে অসন্তোষের কোনও কারণ থাকবে না। আমি বিশেষ করে এই আবেদন জানাচ্ছি যে বাকি বন্দিদের—১৬০০ বন্দির সকলকেই মুক্তি দেওয়া হোক। তাছাড়া ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে যাদের বিরুদ্ধে বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন কোর্টে মামলা দায়ের করা রয়েছে, সেই বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হোক। দিনের পর দিন কোর্টে হাঁটাহাঁটি করিয়েও অপদার্থ পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে কোনও 'চার্জশিট' দিতে পারছে না, তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। তাছাড়া দেশময় যে অসন্তোষ আছে, সেই অসন্তোষ দূর করা হোক।

তারপর বেকার সমস্যার কথা। আজ কাগজে দেখলাম যে ভারত গভর্নমেন্ট বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটা কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। এবং বাংলা

গভর্নমেন্টকে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা স্যাংশন করেছে। আজ দেশময় বেকার সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি ঘরে প্রতি বাড়িতে একটা করে ছেলে—একটা করে কেন, অনেক বাড়িতে কয়েকটা করে বেকার দেখা যাচ্ছে। তাতে করে মধ্যবিত্ত পরিবারের যে দুরবস্থা ঘটেছে এবং তাদের সংসার যে কেমন করে চলছে সেটা ধারণা করা কঠিন। প্রতিদিন তাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ছে। সরকার কুটিরশিল্পের কথা বলে—কী ধরনের যে কুটির শিল্প এবং কোন কুটিরশিল্প কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে একথা যখনই সরকারকে বলা হয় তখনই সরকার কুটিরশিল্পের কথা বলে। কিন্তু অন্যান্য দেশে—জাপান প্রভৃতি দেশে কুটিরশিল্প স্মল পার্টস তৈরি করে বিগ ইন্ডাস্ট্রিকে ফিড করার জন্য। আমাদের এখানে যে কুটিরশিল্প—তাঁত বা চরকা বা টেলারিং বা সেরিকালচার অর্থাৎ সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রি— এসবের জন্য একটা 'প্ল্যান প্রোগ্রাম' দরকার। প্ল্যান না হলে সারা বাংলা দেশের কোনও জায়গায় কোনও কুটিরশিল্প বড় শিল্পের সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। কুটিরশিল্প বড় শিল্পকে পূরণ করবে, কিন্তু এই কুটিরশিল্পের বিষয়ে সরকারের কোনও কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান নেই। ডাঃ রায় যদি কুটিরশিল্প সম্বন্ধে এই রকম একটা 'কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান' করতে পারে যাতে করে এক বছর হোক দু'বছর হোক পাঁচ বছর হোক, তাতে হয়ত লোকের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যেভাবে কম্যুনিটি প্রজেক্ট-এর কাজ চলছে তাতে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। কাজ না থাকলে বেকারের সংখ্যা বেড়েই যায় এবং এই বেকারের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কম্যুনিটি প্রজেক্ট দ্বারা দেশের বেকারদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এক কলকাতাতেই ১ লক্ষ ৪০ হাজার মধ্যবিত্ত বেকার, তাছাড়া আরও ২ লক্ষ ৫৭ হাজার বেকার আছে— তার মধ্যে অন্যান্য সাধারণ লোকও রয়েছে। কাজেই এই সমস্ত বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য এমন ধরণের 'প্ল্যান' করা উচিত যাতে করে প্রতিটি লোকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং মাথা গোঁজার জায়গা হয়। দেশকে উন্নত করতে হলে যে সমস্ত লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত রয়েছে তাদের যতখানি জমি দরকার তা তাদের দিতে হবে। তাছাড়া বাকি লোককে শিল্পের উন্নতি দ্বারা কুটির এবং বড় শিল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করে একটা 'প্ল্যান' করে প্রোভাইড করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৫ মার্চ, ১৯৫৪।

অস্থির শ্রমিক নীতি

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, সরকারি শ্রমিক নীতির কোনও স্থিরতা নেই। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা নেই। মালিকদের তোষণ করাই হচ্ছে সরকারি নীতি। সরকার যেভাবে ডিসপুট সম্পর্কে কনসিলিয়েশন এবং ট্রাইবুনাল চালাচ্ছে তাতে শ্রমিকদের স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। ফলে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়েই যাচ্ছে। এ বছরে প্রায় ১২ হাজার মধ্যবিত্ত লোক ছাঁটাই হয়েছে।

তারপর এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে। এই ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ আমাদের দেশে রয়েছে। এই সব এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে ছোট ছোট পোস্ট তৈরি করা যায়। এমন অনেক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি সেদিক থেকে বিরোধী।

পাঁচ বছরে ফাইভ ইয়ারস্ প্ল্যানে যে টাকা খরচ করার কথা ছিল তাতে গভর্নমেন্টের ৯৩৮ কোটি টাকা খরচ করবার কথা। প্রথম দু-বছর গভর্নমেন্ট ৩২.৬ কোটি টাকা খরচ করেছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে যেখানে ২৩৩ কোটি টাকা খরচ করার কথা ছিল সেখানে তারা দু-বছরে মাত্র ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই প্রাইভেট সেক্টর করে দেওয়া হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু ধনিক এবং মালিকেরা যে সে টাকা খরচ করছেন না সেজন্য গভর্নমেন্টের উচিত একটা শক্ত নীতি গ্রহণ করে তাদের বাধ্য করা যে তোমাদের খরচ করতেই হবে, ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিক দিয়ে গভর্নমেন্ট কোনও এফেক্টিভ স্টেপ নিচ্ছে না।

তারপর কতগুলি বিষয়ে গভর্নমেন্টের কোনও নীতি দেখতে পাচ্ছি না। জুট কটন, কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল সব জায়গায়ই ছাঁটাই হচ্ছে এবং ছাঁটাইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রিট্রেঞ্চমেন্ট বন্ধ করতে না পারলে গভর্নমেন্টের শ্রমিক নীতির কোনও সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। লেবার কমিশনারের অফিসে যে সমস্ত বিষয় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আনা হয়, সেখানে যে নীতিতে কাজ চলে, হ্যাফাজার্ড ভাবে, এবং যেরকম অসঙ্গতভাবে সেখানে কাজ হয় তাতে সহস্র সহস্র কনসিলিয়েশনের কোনও ব্যবস্থাই হয় না। লেবার ডিরেক্টরে শুধু ধনিকের স্বার্থই রক্ষিত হয়। তাছাড়া ট্রাইবুনালের যে অ্যাওয়ার্ড হয় সেগুলিও চটপট কার্যকর করার কোনও চেষ্টা নেই। এখানে আমি দু'একটা কোম্পানির নাম করব যারা অ্যাওয়ার্ড হবার পরে সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট

করেনি। এই হাউসে অনেকবার বলা হয়েছে অ্যাওয়ার্ড ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এমন নীতি উদ্ভাবন করা হোক যাতে মালিকদের বাধ্য করা যায় অ্যাওয়ার্ডগুলি মেনে নিতে।

তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কিমের দাবি বহুদিন ধরে রয়েছে। গভর্নমেন্ট যে হাউসিং স্কিম নিয়েছে এটা পুরনো। জানি না, এটাও বা কতদিনে কার্যকর হবে। শ্রমিকদের জন্য যাতে হাউসিং স্কিমের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাটা হয় সেইটে করতে সরকারকে বলব। দু-এক জায়গায় হাউসিং স্কিম করেছে, তাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা কী করে হবে আমি বুঝতে পারি না।

ট্রাইবুনাল ডিরেক্টরেট ৮ বছর ধরে টেম্পোরারি ভাবে কাজ করছে। যতগুলি ট্রাইবুনাল আছে, তাতে করে এক একটা মামলা নিষ্পত্তি হতে প্রায় এক বছর দেড় বছর লেগে যায়। ট্রাইবুনালের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বার বার এই হাউসে বলা হয়েছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে লেবারের বিরুদ্ধে তারা যে ভাবে কাজ করছে তা সমর্থন করা যায় না এবং এই সব কারণে স্ট্রাইক হয়। শ্রমিকদের অসন্তোষ যখন বেড়ে চলেছে, তখন তাড়াতাড়ি সরকারের উপযুক্ত নীতি অবলম্বন দ্বারা তাদের অভিযোগগুলি দূর করা উচিত। অনেক সময় দেখা গেছে শ্রমিকদের কমপ্লেনগুলি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থার অভাবেই শ্রমিক অশান্তি ও সোস্যাল সিকিউরিটি ব্যাহত হয়ে পড়ে। এইভাবে শ্রমিকদের দুঃখের মাত্রা যখন বেড়ে ওঠে, যখন তারা নিজেরা কোনও পথ শান্তিপূর্ণভাবে খুঁজে পায় না এবং লেবার দপ্তরের কাছেও কোনও সাহায্য পায় না তখন তারা আইনসঙ্গতভাবে ধর্মঘট করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

বি এন এলিয়াস হচ্ছে একটা সেই কোম্পানি যে কোম্পানির শ্রমিকেরা কতগুলি দাবিদাওয়া উপস্থিত করেন এবং সেই দাবিদাওয়া কনসিলিয়েশনের জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে শ্রমদপ্তরের কাছে জানান। কিন্তু শ্রমদপ্তর কনসিলিয়েশন সম্বন্ধে কোনও উত্তর দেয়নি। দেখা গেছে, আমি নাম করতে চাই না, লেবার বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মিঃ চাটার্জি বি এন এলিয়াসের প্রোডাক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ গার্বোর সঙ্গে একত্র বসে ব্রিস্টল হোটেলে খানাপিনা করে থাকেন। বি এন এলিয়াসের দুটো কেস ডিসচার্জ হয়ে গেল। সেই কেস দুটো যে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি কোনও রেকমেন্ডের ব্যবস্থা করলেন না। আর একটা কেস সেকশন টুয়েন্টির, ১৮ই মে ১৯৫৩তে দেওয়া হয়েছিল। তারও কোনও রকম কনসিলিয়েশনের ব্যবস্থা হল না। বি এন এলিয়াস কোম্পানিতে তিনটে করে বোনাস দেওয়া হত, কিন্তু তাদের দুটো বোনাস দেওয়া হল এবং

শ্রমিকেরা সে বিষয়ে লেবার ডিপার্টমেন্টকে জানাল। কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা করা হল না। কাজেই এ দিক থেকে গভর্নমেন্টের যে নীতি তা যে কী রকম ভ্রম ও-ত্রুটিপূর্ণ এবং সে নীতির যে কোনও স্থিরতা নেই এতে তাই প্রমাণ হচ্ছে।

রামপুর সুগার মিল সম্বন্ধে রণেনবাবুই বলেছেন, আমি আর বলতে চাই না। বেঙ্গল কেমিক্যালে একজন কেমিস্ট ও ৬ জন লোককে ডিসচার্জ করে দিলে তার বিরুদ্ধে শ্রম দপ্তরকে জানানো হল, তাঁরা কোনও ব্যবস্থা করল না। এই যে একটা নীতি চলছে এটা সমর্থন করা যায় না।

১১ মার্চ, ১৯৫৪।

চাষীদের উৎখাত করা হচ্ছে

মাননীয় স্পিকার মহোদয়, বর্গাদার অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সার্কুলেশনে দেবার যৌক্তিকতা হচ্ছে—১৯৫০ সালে যে বর্গাদার অ্যাক্ট পাস হয়েছিল তাতে যে ক্লজে দুস্থ বর্গাদারদের এভিক্ট করা যাবে সেই ক্লজের বিরুদ্ধে আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাই এবং সে আবেদন বরাবরের জন্য ছিল। সেই অ্যাক্ট পাস হবার পরে জমির মালিকেরা ও জোতদারেরা হাজার হাজার বর্গাদারদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে আরম্ভ করেছে। ভাগচাষী বোর্ড যেখানে যেখানে হয়েছে সেখান থেকেও, ভাগচাষী বোর্ড থাকা সত্বেও অনেক জায়গায়, আমি জানি বনগাঁয়ের সম্বন্ধে, সেখানে সম্পূর্ণ নিরক্ষর সর্দার বলে একশ্রেণীর সিডিউল্ড ট্রাইব আছে, তারা বহু দিন ধরে ভাগচাষ করে। তারা জানে না কোথায় কি করতে হবে না করতে হবে, তাদের কাগজ বা নথিপত্র কিছু নেই, তাদের সহজেই জোতদারেরা বহুদিন ধরে যে সব জমিতে ভাগচাষ করে আসছে সেই সব ভাগচাষ থেকে তাদের উৎখাত করেছে। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্ত কিষাণসভা আন্দোলন করে এসেছে, জনমত গঠন করে এসেছে, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়দের কাছে বলা হয়েছে। তার ফলে এই দুটি অর্ডিন্যান্স পর পর জারি করা হয়েছে। প্রথম অর্ডিন্যান্সটা যখন করেছিল তখন মনে হয়েছিল গভর্নমেন্ট যাতে ভাগচাষীরা জমি থেকে উৎখাত না হয় এবং যাতে জোতদারেরা তাদের সহজে উৎখাত করতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিল। যদি অন্যায়ভাবে উৎখাত করে তাহলে ছ'মাস জেল এবং জরিমানা উভয়ই হবে।

তারপর যখন হঠাৎ দেখল যে এতে তো খুব একটা অন্যায় হয়ে গেছে, ভাগচাষীদের স্বার্থের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়ে গেছে, জোতদারদের স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা অর্ডিন্যান্স সৃষ্টি করা হল। যে অর্ডিন্যান্সের দ্বারা যারা এভিক্ট হয়ে যাবে বা যাদের জমি জোতদাররা অন্য লোক দিয়ে চাষ করাবে, ভাগচাষ বোর্ডে হোক, বা এস ডি ও-র কাছে দরখাস্ত করে হোক, যদি প্রতিপন্ন হয় যে ভাগচাষীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে জোতদার বঞ্চিত করেছে, তাহলে ভাগচাষীর পক্ষে ভাগচাষ বোর্ড বা এস ডি ও কর্তৃক জমিতে তার কালটিভেশন রেস্টোর করা হবে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। কিন্তু সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে ফসলের যা ন্যায্য মূল্য তা তাকে দিতে হবে। কাজেই এই অর্ডিন্যান্সকে যেভাবে আইনে বিধিবদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে, যেভাবে আইনটা পাস করা হচ্ছে, তাতে মাঝখানে অর্ডিন্যান্স

পাস করার আগে ঠিক যে অবস্থা ছিল, আজ এই আইন পাস করেও ভাগচাষীর দূরবস্থা সেই একই থাকবে। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে ওরা যে বলছেন, এই আইনটাকে সার্কুলেশনে দেবার মানে ভাগচাষীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করা। কিন্তু ৫০ সনের অ্যাক্ট পাসের পরে জোতদার ভাগচাষীর ওপর যে অন্যায় অত্যাচার করেছে সেই অন্যায় অত্যাচার এই আইন থেকেই হয়েছে। তাদের যে অন্যায়ভাবে এভিক্ট করেছে সেখানে এই আইনে কি তাদের কোনও স্বার্থ রক্ষা হয়েছে? তাদের কোনও স্বার্থ রক্ষা হয়নি। বরঞ্চ যখন একটা সংশোধনী আইন পাস হতে যাচ্ছে তখন সেই সংশোধনী আইনের বিধানের মধ্যে ভাগচাষীদের যে দুরবস্থা সেটার কারণ তো থেকেই যাচ্ছে। সেই দুরবস্থায় সে এখনও ভুগছে। বরঞ্চ এই আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের কি মত সেটা গ্রহণ করার জন্য চার বছর ধরেই তো তাদের ওপর অবিচার চলেছে, আজ যদি এক মাস বা দু'মাস পাস করতে দেরি হয় তাতে আর এমন কী এসে যাবে। যে বিলটায় তাদের জীবন-মরণ সমস্যা রয়েছে সেটাকে বিশেষভাবে আলোচনা করেই পাস করা উচিত। যদি ভাগচাষী জমি থেকে উৎখাত হয়ে যায় এবং সে জমি যদি অন্যকে দিয়ে চাষ করানো হয়, তারপরে সেই জমিটা তাকে যখন রেস্টোর করা হবে, তখন সেই জমির শস্যের আংশিক মূল্য তাকে আগেই দিতে হবে, সেটা দুস্থ ভাগচাষী পাবে কোথায়? অন্যায় হবে। ভাগচাষী বোর্ডের কাছেই হোক বা এস ডি ও-র কাছে দরখাস্ত করেই হোক, প্রমাণ হলে যে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করছে তাতে গত আইনে যা করা হয়েছিল, অন্যায় ভাবে যদি এভিক্ট করে, তাহলে ছ'মাসের সাজা বা ফাইন হবে কিম্বা উভয়ই হবে। সে আইন এখন অর্ডিন্যান্সে নাকচ করে দিয়ে এই যে ধারা হয়েছে তাতে ভাগচাষীর ওপরই সমস্ত দায়িত্বভার দেওয়া হল, আর অন্যায়ভাবে যে ভাগচাষীকে উৎখাত করা হল , যে নাকি সেই উৎখাত করল তার জন্য শাস্তির কোনও কিছু ব্যবস্থাই রইল না। কাজেই ভাগচাষীর জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের জন্য যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে জনমত নেওয়া খুব দরকার হয়ে পড়েছে। সুতরাং কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে ওঁরা যা বলছেন যে জোতদারের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা বিল পাস করে দিচ্ছেন সেটা অত্যন্ত ভুল। এইজন্য আমি তার প্রতিবাদ করি। অর্ডিন্যান্সে যেখানে বাংলা দেশের সর্বত্র শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেখানে শাস্তিমূলক নতুন অর্ডিন্যান্স পাস হবার পরেও জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে, অনেক সময় এস ডি ও-র সাহায্যেও হাজার হাজার চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করেছে।

সেই চাষীরা, ভাগচাষীরা পুলিশকে জানিয়েছে, পুলিশ এনকোয়ারি করে স্বীকার করেছে। অনেক সময় তারা কিষাণসভার সামনে এসে অনুরোধ জানিয়েছে,

কিন্তু তবু সেটা কার্যকর হয় নি। এস ডি ও-র কাছে দরখাস্ত করেছে। এস ডি ও অনেক সময় হয়ত স্বীকার করেছেন যে অন্যায়ভাবে তাদের এভিক্ট করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশকে যখন অর্ডার দেওয়া হল তখন পুলিশ সেটা কার্যকর না করে জোতদারদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত অনেক—ঘটনা রয়েছে, এখানে সেগুলি বললে অনেক সময় যাবে, যেহেতু সময় কম। যাই হোক, এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে জোতদারদের স্বার্থে যেটা কার্যকর করা উচিত ছিল সেটা হয় নি। তারা বার বার এস ডি ও-র কাছে টেলিগ্রাম করেছে, পুলিশকেও বলেছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রায় গিয়েছে। বাস্তবিক পুলিশ যা করেছে তা যদি দেখেন, দেখবেন পুলিশের যে রিপোর্ট, ও সি একরকম দিলেন, হয়তো একজন এস আই বা এ এস আই অন্যরকম দিলেন। হয়তো ও সি রিপোর্ট দিলেন অন্যায়ভাবে উৎখাত করা হয়েছে, কিন্তু এস আই-র রিপোর্ট অন্যরকম।

ভাগচাষ বোর্ডের রায়ে চাষী উৎখাত হল। তারপর সেটা অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে দরখাস্ত করা হলে সেই বোর্ডের রায় নাকচ করে দেওয়া হল। যখন এস ডি ওকে সেই রায় জানানো হল এস ডি ও পুলিশের কাছে দিলেন। কিন্তু পুলিশ সেই রিপোর্ট না পাঠিয়ে আর একটা রিপোর্ট এস ডি ও-র কাছে দিল। এরকমভাবে হাজার হাজার চাষীর উৎখাতের ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই এই যে বিল আনা হয়েছে এটা কৃষকদের, ভাগচাষীদের জীবন-মরণ সমস্যা—এটাই জনমত প্রচারের জন্য দিলে ভাল হয়।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪।

পুলিশের অত্যাচার

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার পর আমরা ভেবেছিলাম যে পুলিশের চরিত্র, পুলিশের ব্যবহার, পুলিশের কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। পুলিশ জনসাধারণের সেবকরূপে কাজ করবে, যে কথা গভর্নর বা মন্ত্রীরা পুলিশ সভায় বা পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনে বলে থাকেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশের চেহারা, পুলিশের চরিত্র দিনের পর দিন আরও বিশেষভাবে অত্যাচারমূলক হয়ে পড়েছে। তাদের ব্যবহার জনসাধারণের প্রতি অত্যধিক কদর্য হয়ে পড়ছে। তারা নানারকম নৃশংস কাজ করতে ভয় পায় না। আমার সময় অল্প, কাজেই বিশেষ কিছু বলতে পারব না। আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। সম্প্রতি বাঁশবেড়িয়ায় একটা বিশেষ মর্মান্তিক নৃশংস বর্বর কাজ হয়েছে পুলিশের দ্বারা। ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারি ১২৬ জন মহিলা কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। ডবল শিফ্‌ট-এ কাজ করবে বলে এই সব মহিলা কর্মীরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং জানতে চান তাঁদের কী জন্য ছাঁটাই করা হয়েছে। ম্যানেজার বলেন, জুট মিলের লেবার ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট মাননীয় ব্যোমকেশ মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ছাঁটাই করা হয়। তখন তাঁরা ব্যোমকেশবাবুর কাছে যান এবং তাঁরা দেখেন যে নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে। কাজেই তাঁদের তখন ব্যোমকেশবাবুর ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং তাঁরা তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যান। ম্যানেজার দেখা করতে চাননি। ২রা মার্চ ৩০ জন মেয়ে কর্মী ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু দেখা করতে পারেননি। তখন তাঁরা লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যান, তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে পারেননি। তখন একজন মহিলা কর্মী লেবার অফিসারের পেছন দিকে যান। তখন সেই লেবার অফিসার কেরাণীকে বলে, একে ঘর থেকে বার করে দাও। তখন তাঁকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়। তারপর আরও এক্সাইটমেন্ট হয়। তারপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের তাড়া করে। সমস্ত মিল থেকে ওয়ার্কাররা বেরিয়ে আসে, পুলিশ তাদের পেছন পেছন আসে। তারা লাইনের মধ্যে ঢোকে এবং পুলিশও সেই লাইনের মধ্যে ঢোকে। তখন মিলের গেট থেকে হাজার গজ দূরে বেঙ্গল চটকলের প্রাদেশিক কর্মীকে পুলিশ গুলি মারে, এবং শুধু গুলি মেরেই ক্ষান্ত হয় নি, বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে। শুধু তাই নয়, পুলিশ এমনই বেপরোয়া গুলি চালায় যে পাশে যে বাজার ছিল সেইখানে একজন কলা বিক্রি করছিল, সেই মোস্তাফা বলে

লোকটির গায়ে গুলি লাগে এবং সে মারা যায়। তারপর কাদির বলে একজন চাবি সারাতো, তার অ্যাবডোমেনে গুলি লাগে এবং সে হাসপাতালে মারা যায়। আর একজন এরকম মারা যায়। মিলের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যার জন্য পুলিশ এরকমভাবে নৃশংস বর্বরোচিত বিবেচনাহীন কাজ করতে পারে। মিলের বাইরে তারা এসেছে, ১ হাজার গজ দূরে যখন তারা এসেছে তাদের পেছনে পুলিশই প্রথমে তাড়া করেছে, তাদের ওপর অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে। কাজেই পুলিশের বর্বরতা, ব্যবহার দিন দিন যে অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে সেটা এই একটা ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

তারপর দিন দিন দেশে ডাকাতির সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। আমাদের সহকর্মী নরেন ঘোষ মহাশয় ডাকাতির সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নটা ডিসঅ্যালাউড হয়েছে। খানাকুলে ৮/১০টি ডাকাতি হয়েছে। এর পূর্বেও ডাকাতি হত। তখন অনেকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের জেলে পাঠানো হয় এবং তাতে ডাকাতি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তারা কেউ কেউ মুক্ত হয়ে এসেছে এবং সেখানে আবার ডাকাতি চলছে। গত ২২/২/৫৫ তারিখে খানাকুলে কত বড় ডাকাতি হয় তা আপনারা হয়ত কেউ কেউ জানেন—সেই ডাকাতিতে গৃহস্বামীকে হত্যা করা হয় এবং বাড়ির আরও কয়েকজনকে ভীষণভাবে আঘাত করা হয়। এরকমভাবে ডাকাতির সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। পুলিশ এসব কাজে বিশেষ কোনও স্টেপ নিচ্ছে না।

তারপর বন্দুকের লাইসেন্সের ব্যাপারে যথেচ্ছাচার চলছে। আমাকে একজন চিঠি লিখে মগরা থানা থেকে বলেছে। বৈজনাথ ঘোষ মহাশয় একজন বিশিষ্ট লোক। সেখানে ডাকাতি হচ্ছে বলে আত্মরক্ষার জন্য একটি বন্দুকের লাইসেন্স চান তিনি। কিন্তু তাঁকে বন্দুকের কোনও লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। অথচ এক বাড়িতে, খালান্দো থানার মগরা হাটে ৩ ভাই—এদের নাম হচ্ছে (১) সেখ দাউদ (২) রহমন (৩) চাকলানি—এদের তিন ভাইকেই বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈজনাথ ঘোষ মহাশয়কে লাইসেন্স দেওয়া হল না।

তারপর বজবজ এবং মহেশতলা থানায় অনেকগুলি বাজির কারখানা আছে। বলরামপুর চিংড়িপুর ইত্যাদি বাজির কারখানায় প্রতিদিন এবং প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাতে অনেক লোক মারা যায়। সেদিকে পুলিশের খেয়াল নেই। পুলিশের ব্যবহার এবং চরিত্র দিনের পর দিন নির্মম হয়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছেন। আমরা যেভাবে সহযোগিতা করতে চাই তারা তা গ্রহণ করে না। আমরা কলকাতায় গুন্ডামি দমন করবার জন্য সহযোগিতা করলাম, কিন্তু তারা কতগুলি ইনোসেন্ট ছেলে ধরে নিয়ে জেলে পুরে

রাখল। তারপর সম্প্রতি শ্যামপুকুর থানায় এক স্ত্রীলোকের গলার হার খোয়া গেল, কিন্তু পুলিশে অভিযোগ করেও কিছুই হল না। আর একটি মেয়ের কান থেকে মাকড়ি কেড়ে নিয়ে গেল—তারপর আর এক জায়গায় দিনের বেলা তিনটে সময় ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়ে গেল এসবের কিছুই হল না। এই রকম অবস্থা লেছে। যদি আমাদের সহযোগিতা পেতে চান তাহলে পুলিশের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বদলাতে হবে। এখন পুলিশ যেভাবে চলছে তাতে কোনও ভাল লোক পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না।

১১ মার্চ, ১৯৫৫।

পুনর্গঠন ভাষার ভিত্তিতে

স্পিকার মহোদয়, স্টেট রিঅরগানাইজেশন রিপোর্টের কথা শুনে মনে হয়েছিল যে, সারা ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য, যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, এস আর সি রিপোর্ট এমনভাবে রচিত হবে যে এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করবে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল যে এস আর সি রিপোর্ট দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন প্রকার নীতি গ্রহণ করেছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তারা নিশ্চয়ই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা, সংস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। না হলে দক্ষিণ ভারতে যেভাবে ভাষার ভিত্তিতে দেশবিভাগের কথা বলেছিল উত্তর ভারতে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয় তারা নিয়ে এল। আপনারা জানেন, ভারতবর্ষকে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের করায়ত্ব করেছিল, হাতে রেখেছিল নিজেদের স্বার্থ পালনের জন্য এবং বিভিন্ন প্রদেশকে তারা বারবার বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। বাংলাকে বারবার বিভক্ত করেছে, আসামকে বিভক্ত করেছে, বিহারকে বিভক্ত করেছে। এইভাবে তাদের নীতি তারা পরিচালিত করেছে। বাংলাদেশ থেকে জাতীয় আন্দোলনের যে উদ্ভব, যে প্রসার এবং বাংলাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য যে বৈপ্লবিক ও জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে সেই কারণে বাংলাকে তাঁরা বারবার বিভক্ত করেছে। এইভাবে সেই যে তাদের দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির অবসানের জন্য কংগ্রেস বারবার প্রতি অধিবেশনে প্রস্তাব পাস করে এসেছে যে তার যখন হাতে ক্ষমতা পাবে তখন ভাষার ভিত্তিতে তারা প্রদেশগুলিকে গঠন করবে। তারা প্রতিবারই প্রতি কংগ্রেস অধিবেশনে এই প্রস্তাব পাস করে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে ঠিক সেই নীতি তারা রক্ষা করছে না। তারা আরও অনেকরকম ব্যাপার এই দেশ বিভাগের মধ্যে নিয়ে এসেছে। ইংরেজ ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া নিয়ে আসাম গড়ে তোলে। প্রতিবাদ হয় বাংলা থেকে, কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। লর্ড র‍্যাডক্লিফের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো হয় এবং তিনিও সে সম্বন্ধে কোনও কান দিলেন না। কারণ বড় বড় শেতাঙ্গ চা-করদের স্বার্থ তার কাছে বড় ছিল। তারপর বাংলাদেশ লর্ড কার্জনের সময়ে বিভক্ত হল। রদ করার জন্য বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হল। বাংলায় বিরাট সেই আন্দোলনের ফলে যদিও বঙ্গভঙ্গ রদ হল। একদিকে রদ হল বটে কিন্তু অপর দিকে বাংলার বিরাট অংশ নিয়ে অন্যান্য প্রদেশ গঠিত হল। ১৯১২ সালে বিহারে বাংলার বহু অংশ যুক্ত করে দেওয়া হল। কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেস এবং বিহারের

নেতৃবৃন্দ বাংলার ওপর যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, তা অনুভব করেছিলেন। এজন্য বিহারের নেতৃবৃন্দ, তাঁরা সমস্বরে বললেন, বাংলার যে সমস্ত স্থান বিহারে যুক্ত করা হয়েছে তা বাংলাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

১৯১১ সালের কংগ্রেসে তেজবাহাদুর সপ্রু এবং বিহারের প্রবীন নেতা পরমেশ্বর লাল, তাঁরা এই যুক্তি, এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ১৯১২ সালে বিহারের সর্বদলীয় নেতারা, তাঁরা তা সমর্থন এবং স্বীকার করেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সেই নীতি পরিবর্তিত হল। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার পর তারা প্রতি বৎসর কংগ্রেস সেশনে ভাষার ভিত্তিতে দেশ গঠিত হবে এই যে গৃহীত নীতি, তার থেকে তাঁরা সরে এলেন। প্রথমে গণপরিষদ, সেই গণপরিষদ থেকে দর কমিশন নিযুক্ত হল এবং সেই দর কমিশন, তারা শুধু ভাষার ভিত্তির জায়গায় এই সমস্ত প্রস্তাব, এই সমস্ত শর্ত তারা দিল। স্থানীয় পকেট রাখা চলবে না। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ভারতবর্ষের উন্নয়ন ক্ষমতা ও সীমার মধ্যে এক ভাষাভাষী লোকদের নিয়ে প্রদেশ গঠনে একমত হতে হবে। কোনও ভাষাভাষী অল্পসংখ্যক লোকের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব চলবে না। কাজেই, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে দেশকে গড়ার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল দর কমিশন তা থেকে সরে গিয়ে এই সমস্ত শর্ত নিয়ে এল। তারপর জহরলাল, বল্লভভাই, পট্টাভি তাঁদের নিয়ে একটা কমিটি হল। সেই কমিটির শর্ত হল ভারতের আর্থিক ঐক্য ও নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, অনৈক্য কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। ভাষার ঐক্য চাই—বিভেদ থাকবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করবে। কাজেই তাদের যে নীতি ছিল ক্রমে ক্রমে তারা সেই নীতি থেকে সরে এল। এস আর সি কমিটির রিপোর্টের মধ্যে আমরা সেই নীতির প্রভাব দেখছি, তাতে সেই নীতি কার্যকর হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভাষার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হলে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। সংখ্যালঘুদের ভাষার অধিকাংশের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হতে পারে। এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইংরেজ যেভাবে দেশকে গড়েছিল এবং যেভাবে তারা বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে আজ আট বছরের কংগ্রেসি শাসনে সেই বিষ থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। যখন বিহারে গোলমাল হয়েছে, কি আসামে গোলমাল হয়েছে, সেই গোলমালের সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার প্রতিবাদ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেনি। কাজেই এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ছিল। সেটা স্বাভাবিক। নতুবা ১৯১১/১২ সালে বিহারের নেতারা বাংলার ন্যায্য দাবিকে যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেই স্বীকৃতি থেকে তাঁরা সরে আসবেন কেন? যা বিজ্ঞানসম্মত, যা যুক্তিযুক্ত, যা বাস্তবিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে সেই অনুসারে এস আর সি রিপোর্ট তৈরি হওয়া উচিত ছিল।

আমাদের যে অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করে যদি দেখি তাহলে যে সমস্ত দেশ, রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জাতি থাকার জন্য তাদের মধ্যে যে অনৈক্য ছিল এবং অনৈক্যের জন্য যে সমস্ত দেশ দুর্বল ছিল সেই সমস্ত দেশ কীভাবে সবল হল, শক্তিশালী হল, সে বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, সেটাও দেখতে হয়। আমি সে বিষয়ে বেশি আর কিছু বলতে চাই না। তবে দুই একটি কথা বলি। কারণ সেখানে মূলনীতি ছিল সংস্কৃতি এবং ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা। রাশিয়া, চীন এবং যুগোস্লাভিয়া, তারা এই সমস্যা দূর করেছে। রাশিয়ায় সাতটি জাতি। এই জাতিগুলির মধ্যে প্রথমে ঐক্য ছিল না। গ্রেট রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর তাদের ভাষা চাপাতে গিয়েছিল, কিন্তু ইউক্রেন গ্রেট রাশিয়ার যে ভাষা তা গ্রহণ করল না। জারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তারা করেছিল তার একটা বড় কারণ হল এই যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, ভাষাভাষীর ওপর গ্রেট রাশিয়ার ভাষা চাপানো। সেজন্য তাদের মধ্যে অনৈক্য গড়ে উঠেছিল। ইউক্রেনিয়রা জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবে যে যোগদান করেছিল সেটা তাদের ওপর গ্রেট রাশিয়ার ভাষা চাপানোর জন্য। কাজেই আজ ভারতবর্ষে যে ব্যবস্থা হতে চলেছে, এস আর সি রিপোর্টে যেকথা বলা হয়েছে তাতে আমাদের দেশ দুর্বলই থেকে যাবে। যেখানে যেখানে বাঙালি আছে, আসামেই থাক আর বিহারেই থাক, তাদের ওপর, তাদের শিক্ষার ওপর, সংস্কৃতির ওপর যে অত্যাচার চলেছে সে অত্যাচার নিবারণ করার কোনও ক্ষমতা, কোনও নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেনি। আর যে সেন্সাস রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে দেশকে বিভাগ করা হয়েছে সেই সেন্সাস রিপোর্ট সম্বন্ধে এস আর সি নিজেও স্বীকার করেছে যে, বাংলা এবং বিহার গভর্নমেন্ট ১৯৫১ সালে যে সেন্সাস রিপোর্ট তৈরি করেছে সেটা তারা স্বীকার করেনি। তার প্রতিবাদ করেছে। তারপর এস আর সি রিপোর্টে বলা হয়েছে , It is true that the latest census figures show as compared with the figures of 1931, very striking variations which cannot be satisfactorily explained. কাজেই ১৯৫১ সালের সেন্সাস সম্বন্ধে এস আর সি নিজেরাই এই কথা বলেছে। বাংলা ও বিহার উভয়েই ১৯৫১ সেন্সাসকে স্বীকার করেনি—এই কথা তারা বলেছে। কাজেই সেদিক থেকে ১৯৫১ সালের সেন্সাস নীতি তারা গ্রহণ করেছে একথা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং তাদের কথাই সেটা নয়।

মানভূমে সমস্তই বাঙালি এবং মানভূমে যাঁরা আছেন তার বেশির ভাগই বাংলায় কথা বলেন। সাংস্কৃতিক ভাষা বাংলা। প্রথমত ধানবাদ শহরটা মানভূমের ক্যাপিটাল। কাজেই মানভূমের যে রাজধানী, সেখানে বিভিন্ন স্থানের লোক এসে কাজ করবে, এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যেমন কলকাতা শহরে ভারতবর্ষের সব

জায়গা থেকে লোক এসে তাদের জীবিকা অর্জন করে, কিন্তু তাদের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকার করা হয় না। সেদিক থেকে ধানবাদকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে মানভূমের যে ঐক্য, তার যে সংস্কৃতি, তার যে অর্থনৈতিক জীবন তার কোনও মূল্য থাকে না। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে দেখতে পাচ্ছি যে, মানভূমে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল ৬৭.৫ এবং হিন্দিভাষীর সংখ্যা ছিল ১৭.৮। কাজেই সেদিক থেকে যদি বলা হয় যে দামোদর নদী এই মানভূমকে বিভক্ত করেছে এবং দুটি এলাকাকেই ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে; কিন্তু চাস্ থানা যেটা নদীর এই দিকে, তাকে বাদ দেবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স যদি বিবেচনা করে দেখি তাহলে মানভূমের ধানবাদ শহর সেটা পশ্চিম বাংলায় আসা উচিত। সেখানে যে কয়লা আছে সেই কয়লা হচ্ছে বিহারের একটি অর্থনৈতিক সম্পদ। কিন্তু কয়লা বেশিদিন থাকবে না। ২৫ বৎসরের মধ্যে, কোল কমিশনার্স রিপোর্ট অনুসারে, এই কয়লার অবসান ঘটবে। আর সেই কয়লার জন্য যে আয় হয় তার অধিকাংশই লোকাল বোর্ড এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পায়।

বিহারের এই সামান্য কয়লার জন্যে, ধানবাদ যদি পশ্চিম বাংলায় আসে, তাতে বিহারের অর্থনৈতিক জীবন যে বিপন্ন হয়ে পড়বে তার কোনও মানে নেই। তারপর ধলভূম। এস আর সি রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, সেখানে বাঙালির সংখ্যা বেশি, কিন্তু সেই ধলভূমকে কোনও শর্তে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব নেই। জামশেদপুর যা পুরনো সাঁকচি এবং আরও ১৮টি বাঙালিদের গ্রাম নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই জামশেদপুর ঠিক ধানবাদের মতো। যেমন ধানবাদে বিভিন্ন দেশের লোক কাজ করে এই জামশেদপুরেও তাই। তাই জামশেদপুরের ফ্লোটিং পপুলেশন ধরলে জামশেদপুর একটা হিন্দি শহর হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু কোনও জায়গায় ফ্লোটিং পপুলেশনটাকে ধরা হয়নি, যেমন কেরলের বেলায়। কাজেই জামশেদপুরকে, ধলভূমকে বাংলা থেকে আলাদা করে রাখার কোনও যুক্তি বুঝি না। ধলভূমের বেলায় বলা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আদিমকালেও এটা বাংলার অংশ ছিল। ব্রিটিশ আমলে এটা মেদিনীপুরের অংশ ছিল। ১৮৭৬ সাল থেকে এটা বেঙ্গল জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে ছিল ১৯১০ সাল পর্যন্ত। জামশেদপুরের বেলায় দেখেছি যে, জামশেদপুর, সাঁকচি এবং ১৮টি বাংলা গ্রাম নিয়ে সৃষ্টি হয়। বাংলার প্রতি সেক্ষেত্রেও অবিচার করা হল। তারপর সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া, পাঁকুড়, রাজমহল, দুমকা, দেওঘর সব জায়গায় যথেষ্ট বাঙালি আছে। রাজমহলের বেলায় বলা হয়েছে, এখানে যে কয়লা আছে তা বিহারের একটা আর্থিক সম্পদ। কিন্তু যদি আপনারা স্ট্যাটিসটিক্স দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, বিহারের বোকারোতে প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে, রামগড়ে প্রায় ৫ মিলিয়ন টন আছে এবং এই রকম

আরও অনেক জায়গা থেকেই বিহারে প্রচুর কয়লা সম্পদ আসে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বিহারে যে কয়লা আছে তা যথেষ্ট, ধানবাদের কয়লা এবং সাঁওতাল পরগণার রাজমহলের কয়লা গেলে বিহারের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। বাংলার অর্থনৈতিক জীবন আজ বিপন্ন, প্রতি বছর বাজেটে প্রায় ৮/১০ কোটি টাকা ঘাটতি চলছে। এস আর সি যদি ঠিক বিচার করত তাহলে এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করত। তারা যা করেছে, তা অত্যধিক পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়।গোয়ালপাড়া সেন্সাস সম্বন্ধে স্ট্রাইকিং ভ্যারিয়েশনের কথা উল্লেখ করেছে। তারা যদি সত্যিই সেই ১৯৫১ সালের সেন্সাসে বিশ্বাস না করত তাহলে কী করে গোয়ালপাড়া বাংলায় যুক্ত হবে না, একথা বলল? কাজেই এই কমিশনের যে যুক্তি তা অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে করি। ১৯৫১ সালের সেন্সাসের পরে গোয়ালপাড়া থেকে আর কোনও এক্সোডাস হয়নি যাতে করে সেখানে বাঙালির সংখ্যা কমে যায়। বেঙ্গলি স্পিকিং পপুলেশন সেখানে যা আছে বা যা ছিল তা যখন কমে যায়নি, বরং বাস্তুহারাদের যাওয়ার জন্যে সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে, ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালির সংখ্যা অত্যধিক বেশি তাহলে কোন যুক্তিতে গোয়ালপাড়াকে তারা বাংলার সঙ্গে যুক্ত করবে না? কাজেই সেদিক থেকে আমাদের যে দাবি, যে উইশেস অব দি পিপল-এর কথা আমরা বলি, তাদের ইচ্ছাকে বিচার করতে হবে এবং তার প্রতি সঙ্গত সম্মান দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনসাধারণ যখন চায় যে ত্রিপুরা স্বাধীন থাকুক, আমরাও সেক্ষেত্রে চাই যে ত্রিপুরার স্বাধীন থাকা উচিত। আসামের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেবার কোনও মানে হয় না। লিঙ্গুইস্টিক বেসিস, কনটিগুইটি অফ এরিয়াজ এবং উইশেস অব দি পিপল—এই তিনটির ওপরে ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে যে সমস্ত স্থান যুক্ত হওয়া উচিত, যেমন ধলভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ, গোয়ালপাড়া এবং স্বাধীন ত্রিপুরা। এদিক থেকে বাংলা যে দাবি করেছে, আন্দোলন করেছে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে এবং অ্যাসেম্বলি থেকে আমাদের এই মত ওয়ার্কিং কমিটির কাছে দিতে হবে। জানি না ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা সুবিচার হবে কিনা।

আমি জানি না, বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের যে আন্দোলন করতে হয়েছিল, বাংলাকে জোড়া লাগাবার জন্য, সেইভাবে আমাদের আন্দোলন করতে হবে কিনা। আমরা বাঙালি, আমরা বাঁচব কী করে? কাজেই আমাদের বাঁচতে হলে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। আজকে বিহার গভর্নমেন্ট এবং তার পিপল সকলে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ তা পারেনি। বাংলাদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস পৃথক যে মেমোরান্ডাম দিয়েছিল, সেই মেমোরান্ডামের ওপর যদি দাঁড়িয়ে থাকত, তা থেকে সরে না যেত, তাহলে আজ

বাংলাদেশ এক হয়ে দাঁড়াত, এবং যুক্ত বাংলায় গভর্নমেন্ট অব দি পিপল এবং আমরা বিভিন্ন যে সমস্ত দল আছি, সবাই এক হয়ে বলতে পারতাম। কারণ, যে দাবি বাংলার কংগ্রেস প্রথম করেছিল, সেই দাবি আমরা সকলেই সমর্থন করি। সুতরাং আজ সেই দাবিকে যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে মানাতে হয়, তাহলে আমাদের সকলকে একমত নিয়ে, একত্রিত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সেইজন্য আমি ডাঃ রায়ের কাছে আবেদন করছি, কংগ্রেসের কাছে আবেদন করছি, বাংলার এই দুর্দিনে সকলে মিলে এই ভাষার ভিত্তিতে যাতে দেশকে পুনর্গঠিত করা যায়—সত্যি সত্যি সেই দাবি নিয়ে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে নিশ্চয়ই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের কথা শুনেতে বাধ্য হবে।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৫।

ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে

মিঃ স্পিকার স্যার, ল্যান্ড রিফর্মস বিলে যেভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আমরা বিরোধী দল এই ল্যান্ড রিফর্মস বিল সম্বন্ধে যে সমস্ত সংশোধনী নিয়ে এসেছিলাম চাষীদের প্রকৃত উন্নতি সাধন ও কল্যাণের জন্য, তার অধিকাংশ সংশোধনীই গ্রাহ্য করা হয় নি। কাজেই সেই দিক থেকে বলব, যে উদ্দেশ্যে এই ল্যান্ড রিফর্মস বিল আনা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না।

মিঃ স্পিকার, আপনি জানেন স্যার যে, বাংলাদেশের বিশেষ করে, সমাজ যেভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল এবং কৃষির জমি যেভাবে ক্রমে ক্রমে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল এবং কৃষি থেকে যে আয়, সেই আয়ে কৃষক পরিবারের প্রতিদিনের জীবিকানির্বাহ করা অচল হয়ে উঠছিল, সেই কারণে এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট আনা হয়েছিল এবং তাকে কার্যকর করার জন্য এই ল্যান্ড রিফর্মস বিল আনা হয়েছে। এর দ্বারা কৃষক বা দরিদ্র মধ্যবিত্ত কারও সমস্যার সমাধান হবে না। দেখানো হচ্ছে, আমরা যেন একটা মহা সমস্যার সমাধান করে দিলাম। কিন্তু আইনের ধারণাগুলি যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কোনও সমস্যারই সমাধান হল না, প্রত্যেক সমস্যা আরও জটিলতররূপে আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে। জমির ওপর লোকের যত চাহিদা, যত লোক জমিতে চাষ করে, জমির পরিমাণ অনুসারে তত লোককে জমি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যদি জমিকে এমনভাবে বন্টন করার ব্যবস্থা হত যার দ্বারা অন্তত যত সংখ্যক লোক আছে, তাদের কিছু কিছু জমি দিয়ে তাদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে সেইভাবে বন্টন করা ভাল হত। গ্রামে গ্রামে আমরা ঘুরে দেখছি যে, গ্রামের খুব কম চাষীরই ১০ একর করে জমি আছে। ৫ বিঘা, ১০ বিঘা এইরকম জমি আছে, গ্রামের মধ্যে এইরকম লোকের সংখ্যাই বেশি। কাজেই সেইদিক থেকে দৃষ্টি রেখে জমিকে যদি সেইভাবে বন্টন করা হত তাহলে অনেক লোকের উপকার হত। গ্রামে যত চাষের জমি আছে, তার মধ্যে ১ কোটি ১৭ লক্ষ বিঘা হচ্ছে চাষোপযোগী। সেই ১ কোটি ১৭ লক্ষ বিঘা জমি নিয়ে ১৮ লক্ষ ১০ হাজার কৃষক পরিবার আছে। তার মধ্যে শতকরা ৯০টি পরিবারের ১০ একরের কম জমি আছে। এমন অনেক কৃষক পরিবার রয়েছে যাদের একেবারেই কোনও জমি নেই। আর সমগুণ ভাগচাষী রয়েছে। ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষী কোনও জমি পাচ্ছে না অথচ ইন্টারমিডিয়ারিদের কথা যখন প্রথম এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টে হয়, তখন আমি একথা বলেছিলাম যাদের জীবিকা অর্জনের

অন্য ব্যবস্থা আছে, ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প আছে, তাদের বিলাসিতার জন্য যেন জমি দেওয়া না হয়। কারণ, তারা জমিও পাবে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবে, তাদের জন্য এতরকম সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়। যাদের কোনও জমি নেই, জমির অভাবে যাদের সংসার প্রতিপালন করা চলছে না, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে জমি বন্টন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। বিরোধী পক্ষ থেকে ২৫ একরের পরিবর্তে ১৫ একর জমি দেবার কথা হয়েছিল। কারণ, ১৫ একর করে যদি জমি দেওয়া হয়, তাহলে আরও ১০ একর করে জমি বেশি পাওয়া যাবে এবং সেই জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই সংশোধনীকে গ্রাহ্য করা হয়নি। তারপর হাজার হাজার বিঘা জমি ট্যাঙ্ক ফিশারি বা মৎস চাষ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। জানি, পশ্চিমঙ্গের বহু জায়গায় বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে বহু জমি যেগুলি চাষোপযুক্ত, তাকে ট্যাঙ্ক ফিশারি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলিকেএই বিলের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই জমির পরিমাণ যখন এত কম, তখন যেসব জমিতে চাষ হত, এখন যেগুলিকে ট্যাঙ্ক ফিশারিতে পরিণত করা হয়েছে, সেই সমস্ত জমিগুলি যদি চাষের আওতায় আনা হত তাহলে অনেক সুবিধা হত।

আমি দরিদ্রতম যে চাষী তার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই কথা বলছি। যদিও আমি জানি যে, জমিকে ভাগ করে দিয়েও যতক্ষণ না তার সঙ্গে শিল্পের ব্যবস্থা করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত গরীব কৃষকের কোনও উন্নতি সাধন হবে না। আর যে জমি স্ট্যান্ডার্ড এরিয়ার চেয়ে কম হবে সেই জমি অন্য চাষীকে বা পাশের চাষীকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি জমি আন-ইকনমিক হয়, যদি কারও জমি কেড়ে নেওয়া হয়, তবে যার জমি কেড়ে নেওয়া হবে তার জীবিকার্জনের কী ব্যবস্থা হবে তার কোনও ব্যবস্থা নেই। সে ব্যবস্থা না হলে ৫ বিঘাতেই যদি আন-ইকনমিক হোল্ডিং হয় তবু তাকে সে জমি রাখতে দিতে হবে। কারণ যতক্ষণ না এই ব্যাপারে তার কোনও ব্যবস্থা হয় ততক্ষণ আন-ইকনমিক হোল্ডিং বলে জমি কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।

তারপরে যখন কো-অপারেটিভ ফার্মিং হবে তাতে কৃষকের, যার জমি ২৫ একরের বেশি থাকবে না, সেই জমি কো-অপারেটিভে যাবে। কো-অপারেটিভের দ্বারা বিভিন্ন দেশে চাষবাসের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ আন্দোলন নিয়ে কাজ হয়েছে তা খুব উৎসাহজনক নয়। কৃষকদের মন এমনভাবে তৈরি হয় নি, তাদের এমনভাবে সচেতন করা হয় নি যে, তারা

সকলেই স্বেচ্ছায় কো-অপারেটিভ ফার্মিংয়ে যাবে। কাজেই সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর সুযোগসুবিধা সব কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকে। কর্তৃপক্ষের হাতেই ক্ষমতা যায় এবং সেই ক্ষমতার তাঁরা অপব্যবহার করেন। সেই দিক থেকে বলি, কৃষকদের আগে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন করা উচিত, এবং এই কো-অপারেটিভ ফার্মিংয়ে জমি নেওয়ার সময় যাতে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের অন্তত ২/৫ বিঘা জমি আলাদা থাকতে পারে, যাতে তারা তরিতরকারি শাকসবজি করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। ২৫ একর পর্যন্ত সমস্ত জমিই কো-অপারেটিভে নেওয়া উচিত নয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজেই বিলে এই সমস্ত ডিফেক্ট রয়েছে এবং এতে চাষী পরিবারের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

তারপর রাইট অফ প্রি-এমশন—এতে তাদের কিছু জমি পাওয়ার যে অধিকার থাকবে সে সম্বন্ধে বলি যে, পাশের লোকের যে আন-ইকনমিক হোল্ডিং সেগুলি হাইয়েস্ট বিডারকে বিক্রি করা হবে। এখন পাশে যদি দরিদ্র চাষী থাকে এবং সে যদি জমি নিতে চায় তাহলে সেই আন-ইকনমিক হোল্ডিং পাশাপাশি লোক নিতে পারবে না, হাইয়েস্ট বিডারকে সেটা বিক্রি করা হবে এবং তাতে এরকম দামের প্রতিযোগিতা হবে যে, গরিব চাষী সেই বেনিফিট পাবে না। এই অবস্থায় যদি জমি বিক্রি হয় তাহলে একসঙ্গে একটি কৃষক পরিবারের সেই দাম দেওয়া সম্ভব না হলে সে দাম ইনস্টলমেন্টে নেওয়া উচিত, একসঙ্গে নেওয়া উচিত নয়। কারণ এটা তো সহজেই বোঝা যায়, সেই দরিদ্র কৃষকের এমন অবস্থা নয় যে, তার জমি নেওয়ার দরকার থাকলেও সে সমস্ত দামটা একসঙ্গে দিতে পারবে।

আন্ডার-রায়তদের সম্বন্ধে, যদিও রায়তদের স্বত্ব থাকবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কোনও ধারায় একে নিয়োজিত করা হয় নি। এতে বাস্তবিক আন্ডার-রায়তও মনে করবে যে, তারাও প্রকৃত রায়তদের মতো অধিকার পাবে। ভাগচাষ আইনে যে সমস্ত সমস্যা ছিল, এবং এই ভাগচাষ আইন সেইজন্যই তৈরি হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এই ভাগচাষী আর জমিদারদের সংঘর্ষ বরাবরই রয়ে গিয়েছে। এর কোনও ব্যবস্থাই পরিষ্কারভাবে করা হল না। যে ভাগচাষী বহুদিন ধরে জমি চাষ করছে যদি কোনও কারণে সে চাষ করতে না পারে তাহলে তাকে উৎখাত করা হবে। এইরকমভাবে ভাগচাষীকে উৎখাত করলে কীভাবে সে জীবিকার্জন করবে, কীভাবে তার সংসার চলবে এ বিষয়ে কোনওরকম ব্যবস্থা বিলে করা হয় নি। আমার জমি দরকার, আমার প্রয়োজনে আমি নিলাম, কিন্তু ভাগচাষীর বেলা কী যে হবে, তার সম্বন্ধে এই বিলে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা হল

না। সেদিক থেকে একটা প্রভিশন থাকা উচিত ছিল। যদিও এখানে আছে যে জমি যদি বিক্রি হয় তাহলে বিক্রি করার সময় ২/৩ ভাগ বর্গাদার কিনতে পারবে, কিন্তু জমি যদি বিক্রি হয়—সে তো আলাদা কথা।

রেভিনিউ ব্যাপার নিয়ে বলি—কত রেভিনিউ হবে? আমরা বলেছিলাম, জমির যে ফলন হবে সেই ফলনের ওপরই খাজনার হার ঠিক করা উচিত। অতীনবাবু এ কথা তো পরিষ্কার বললেন যে, দু' হাজার টাকা যাদের আয় তাদের কোনও ইনকাম ট্যাক্স নেই, অথচ কৃষকরা যারা গরিব তাদের দু'একর জমি থেকেই খাজনা দিতে হবে। আর ফসল যদি খারাপ হয় তা হলেও তাদের মুক্তি নেই। এতে কেবল আয়ই হচ্ছে, ব্যয়টা ধরা হচ্ছে না। যদিও দেখা যাচ্ছে যে, ২ একর থেকে ৫ একর, ৫ থেকে ১০ একর, ১০ থেকে ১৫ একর —এইভাবে যদিও আগের চেয়ে খাজনার পরিমাণ কমেছে, কিন্তু খাজনার পরিমাণ কমলে কি হবে? সেজন্য বাহবা নিলে কি হবে? কারণ যা খাজনা ছিল তা দিতে পারছিল না বলেই তাদের হাত থেকে ক্রমেই জমি বেরিয়ে যাচ্ছিল। খাজনা অত্যধিক ছিল বলেই তো জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিল। খাজনা দেবার ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত। ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যয় বাদ দিয়ে খাজনার কথা তোলা উচিত ছিল। কাজেই প্রস্তাবে ছিল যে, দু'একর জমিকে খাজনা থেকে রেহাই দেওয়া হোক। ২ একর অর্থাৎ ৬ বিঘা জমিতে যে ফলন হবে তাতে যে খরচ হবে সেই খরচ করে তারপরে গভর্নমেন্টকে খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এইজন্য বলা হয়েছিল যে, দু'একর যাদের জমি আছে তাদের খাজনা থেকে মুক্ত করা হোক। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৫৫।

গুরুভার উদ্বাস্তু সমস্যা

স্পিকার মহোদয়, আজ ১০ বছর ধরে উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিম বাংলার ওপর গুরুভার সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য যদি সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত তাহলে আজ পশ্চিমবাংলার শাসন ধারার সাথে এই উদ্বাস্তু সমস্যা যেভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, যেভাবে তাদের অর্থনৈতিক জীবন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, যেভাবে বাংলার অবস্থা দিন দিন শোচনীয়ই হয়ে পড়েছে তা নিশ্চয় হত না। ভারত সরকারের কাছ থেকে যে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হত তাহলে সেই টাকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক সমাধান করা যেত। আজ উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেকার সমস্যা, যক্ষ্মা এবং নানা রকম সমস্যা প্রবল হওয়ায় তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা বাংলা দেশের ওপর বিশেষ দৌর্বল্য নিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে একমত যে পশ্চিম পাঞ্জাবের মতো সেখান থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে সমস্ত উদ্বাস্তু যেমন একসঙ্গে চলে এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে যদি সেইভাবে লোক আসত তাহলে পশ্চিমবাংলার অবস্থা যে আরও যে শোচনীয় হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সংখ্যায় উদ্বাস্তুরা বারে বারে এসেছে ঠিক সেইভাবে যদি ভারত সরকার তাদের সাহায্যের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করত তাহলে নিশ্চয়ই আজ এই দুরবস্থা ঘটত না। উদ্বাস্তু আগমন ও তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা চার পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (১) দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কোনও রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সামান্য ডোল এবং পুনর্বসতির জন্য কিছু লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে , (২) ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সুপারিশে পুনর্বাসন সমস্যাকেসামগ্রিক ভিত্তিতে দেখার চেষ্টা করা হয়। সেই সমস্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করতে পারলে উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা অনেক কমে যেত, (৩) ১৯৫৫ সালে দার্জিলিং সম্মেলন হয়। তাতে পরিকল্পনা রূপায়িত করার কোনও কার্যকর পন্থা গ্রহণ না করে তার বিরোধী কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে পুনর্বাসনের সুযোগ অনেক কড়াকড়ি করা হবে, (৪) গত অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় দার্জিলিং সম্মেলনে আরও নতুন নীতি গ্রহণ করা হল—আরও কড়াকড়ি করা হবে। এইভাবে মন্ত্রীদের কমিটি বার বার উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে একবার কতগুলি নীতি গ্রহণ করেছে, আবার পরের সম্মেলনে সেগুলি নাকচ করেছে। এবং পরে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেছে যে উদ্বাস্তুদের শীঘ্র পুনর্বাসন করে দেবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ক্যাম্প তুলে দেবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে বক্তৃতায় বললেন, উদ্বাস্তুরা যে অনবরত পূর্ববঙ্গ থেকে আসবে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা কি চিরকাল দায়ী থাকব?

হরিদাসবাবু যে কথা বলেছেন, বাস্তবিকই পণ্ডিত নেহরু দেশ বিভাগের সময় বলেছিলেন দে আর অব আস, সে কথা তিনি কি ভুলে গেলেন? পূর্ববাংলা একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সেখানে তাদের থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতদিন সম্ভব তারা সেখানে থাকে এবং যখন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তখন তাদের চলে আসতে হয়। কাজেই যে দায়িত্ব ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষে পণ্ডিত নেহরু দেশ বিভাগের সময় গ্রহণ করেছিলেন সে দায়িত্ব এখন নিচ্ছেন ন কেন? সরকার পুনর্বসতি দিয়েছে ৭২,০০০ কৃষক ফ্যামিলিকে। আর ৪৩,০০০ কৃষককে তারা দিতে পারছে না। আমরা দেখছি মন্ত্রী কমিটির যে রিপোর্ট রয়েছে তা এই, স্টেটে ভেস্ট করার ফলে এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমি তারা পেয়েছে। কিন্তু তারা বলেছে লেটারাইট জমি বলে একশত কোটি টাকা খরচা করে পুনর্বাসনের জন্য স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত জমি পাওয়া গেছে এবং মন্ত্রী কমিটির যে রিপোর্ট রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৫.৭৮ লক্ষ একর জমি পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে ২ লক্ষ একর জমি উদ্বাস্তুরা গ্রহণ করেছে। বাকি জমি যে সমস্ত আছে তাতে যদি এই উদ্বাস্তুদের বসানো যায়, কৃষকদের বসানো যায়, ১০ বিঘা করে জমি দিলে আরও ৭০ হাজার পরিবারকে বসানো যাবে। দণ্ডকারণ্যের যে স্কিম তাতে যথেষ্ট টাকা খরচ হবে। হয়ত সেখানে এরকমই কঙ্করময় জঙ্গলময় পাহাড়ময় জমি হবে এবং সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সরকারের নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ হবে। এই গভর্নমেন্ট চাইছে ৬৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১১৩ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু তা থেকে কমিয়ে মাত্র ৬০ কোটি টাকা তারা পাচ্ছে। তারা ৬৬ কোটি টাকা চাইছে এবং আমাদের গভর্নমেন্ট ৬০ কোটি টাকা পাচ্ছে। সেদিক থেকে ভারত গভর্নমেন্টের কাছে পুনর্বাসনের জন্য আরও বেশি টাকা নিশ্চয়ই চাইতে হবে। বরং এই কথা তাদের বলতে হবে যে, দণ্ডকারণ্যে যে স্কিম তাতে যে টাকা খরচ হবে এবং তাতে যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন দেওয়া হবে তার বদলে পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত অনুর্বর এবং জলা জমি আছে সেগুলি আরও বেশি করে উন্নত করে তাতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা বলছেন অনেক জায়গায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান। আমি সম্প্রতি তাহেরপুরের যে খবর জানি, সেখানে স্পিনিং মিল করার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই স্পিনিং মিলের ভার দেওয়া হয়েছিল ধনী ব্যবসায়ীদের ওপর। তারা যেখানেই মিল বা কল প্রতিষ্ঠা করুক না কেন তাদের সবসময় লক্ষ্য থাকবে তারা যাতে বেশি করে শোষণ করতে পারে। সেদিকেই তারা লক্ষ্য রাখবে। কাজেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নীতি যদি কতগুলি ধনীর উপর ছেড়ে দেওয়া

হয় তাহলে কোনও মতেই উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হবে না। সেজন্য আমি বলছি সেটা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের নীতির দ্বারা সেটি করতে হবে। অ্যাডভাইসরি কমিটি হয়েছে। সকলে মিলে যে চেয়েছিল অ্যাডভাইসরি কমিটি তা মাত্র একবার আহ্বান করা হয়েছে এবং তার কাছে এ পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা দেওয়া হয়নি। অথচ আমি বুঝতে পারছি না সরকার এই অ্যাডভাইসরি কমিটি কেন করল। অ্যাডভাইসরি কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সরকারের কাছে আমরা যে দাবি করেছিলাম নিশ্চয়ই তারা তা শুনবে।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

ভয়ঙ্কর খাদ্য পরিস্থিতি

মাননীয় স্পিকার মহোদয়, বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি যে সংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে যদি আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে কেবল বলে ক্ষান্ত থাকতাম তা হলে ১৯৪২ সালে যে দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল এবারেও তাই ঘটত। কিন্তু যেহেতু ১৯৫২ সালে, ১৯৫৩ সালে এবং এবারেও আমরা বিরোধীপক্ষ সবসময় সজাগ এবং সচেতন থেকেছি এবং জনমত সংগটন করে সরকারের ওপর চাপ দিয়েছি, আন্দোলন করেছি তার ফলেই সরকার বাধ্য হয়েছে চালের দাম কমানোর ব্যবস্থা করতে। সরকারের খাদ্যনীতি যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। সকলেই স্বীকার করবেন যে, আমরা সময় থাকতে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা সেসব কথা শোনেনি। কাজেই বাংলাদেশের জনসাধারণ তাদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করা এবং সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোনও পথ বা রাস্তা খুঁজে পায়নি। সরকারের নীতি প্যানিক সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং এই প্যানিক থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। আমাদের চাল, ডাল, লবণ, তেল এবং কিছু মশলা তো আছে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের দাম ইতিমধ্যেই ২০ থেকে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে, চাল ২৮-৩০ টাকা মণ হয়েছে। রেশনিং ওঠার সময় ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা। আস্তে আস্তে ভয়াবহ এই দর ৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মুসুরির ডাল ছিল দশ আনা, বর্তমানে তার দর হয়েছে তেরো আনা থেকে চোদ্দ আনা সের। মুগের ডাল সের এক টাকা চার আনা—অন্যান্য ডালের দামও সেরূপ দাঁড়িয়েছে। মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য, কিন্তু তার দর সাড়ে তিন-চার টাকা সের, এর কমে পাওয়া যায় না। তার জন্য সরকার ডিপ-সি ফিশিং প্রভৃতি করে নানা রকমে প্রচুর খরচ করেছে, অপব্যয় করেছে, তথাপি তার কোনও সুরাহা সরকার করতে পারে নি। চিনির দাম বার আনা থেকে এক টাকা দু'আনা সের হয়েছে এবং চিনির সঙ্গে সঙ্গে গুড়ের দামও বেড়ে গেছে। তাছাড়া মশলার দামও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। জিরে সাড়ে চার টাকা, ধনে এক টাকা, শুকনো লঙ্কা দু'টাকা, লবঙ্গ আঠার টাকা, গোলমরিচ চার টাকা। এই সমস্ত দাম অত্যন্ত বেড়েই চলেছে। বিরোধী পক্ষ থেকে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকারকে বার বার সাবধান করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না। বেকার সমস্যা বাড়ছে। অগ্নিমূল্যের ফলে এই সমস্ত জিনিস কেনার টাকা নেই। কিন্তু যেহেতু সরকারের সঙ্গে এই সমস্ত চোরাকারবারীদের যোগাযোগ অনেক বেশি সেইজন্য যখন তাদের বলা হয় যে এ বিষয়ে সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তখন

তারা বলে যে, ব্যবস্থা আমরা কী করব, আমাদের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের ক্ষমতা নিতে হবে।

বাংলাদেশে এই অবস্থা দিনের পর দিন চলেছে। তাহলে কেন এই চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য, অগ্নিমূল্য জিনিসের দাম কমাবার জন্য সরকার যেটুকু করতে পারে তাও করে না? দরিদ্র জনসাধারণ এই অত্যধিক দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি হেতু যে অবস্থায় পড়েছে সেটা চলতে দেওয়া তাঁদের উচিত নয়। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থাই করতে চায় না। যখন চালের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা বলেছিলাম যে, মিলমালিকদের কাছ থেকে সমস্ত চাল—অন্তত ৫০ ভাগ চাল—নেওয়া হোক—সরকার তখন সে কথা শুনল না। তাঁরা মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ চাল নিল। আজ পর্যন্ত মিলের চাল বেহালার বাজারে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা দর। এই সব দেখে মনে হয়, শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যেকথা বলেছিলেন, সেই কথাই প্রমাণ হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে ওই সব মিলমালিকদের ওই চোরাকারবারীদের যোগসাজস আছে। অবস্থা দিনের পর দিন দুর্বহ হয়ে পড়ছে এবং সেইজন্য চতুর্দিকে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ ও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। অনেক জায়গায় মানুষ অনাহারে, অর্ধহারে রোগজীর্ণ হয়ে মরতে আরম্ভ করেছে। এ-থেকে রক্ষার জন্য সরকার আর কোনও রাস্তা দেখছে না। একমাত্র পথ হচ্ছে যে, তোমারা বায়ুভুক হয়ে থাক। সরকারি নীতি এই রকমই হয়েছে। এই দুর্দশা আজ দেশের চতুর্দিকে প্রকট। আলিপুরদুয়ারে চালের মণ ৩০ টাকা। সেখানে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। গত ১৭ই জুলাই তারা ভুখা মিছিল করেছে, সরকারি অফিসে ধর্ণা দিয়েছে। দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ থানার বাতামান গ্রামে পুলিশের গুলিতে ৮ই জুলাই এক সাঁওতাল রমণী মারা যায়। কারণ বুভুক্ষু জনতা চাল বোঝাই গাড়ি আটক করতে বাধ্য হয়েছিল। মনে পড়ে ১৯৪২ সালে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, দোকানে চাল রয়েছে, তবু লোক না খেয়ে মরছে কেন? ওই চোরাকারবারীদের নিয়ে ল্যাম্প-পোস্টে টাঙিয়ে দেওয়া দরকার। আজ লুটপাট হয়েছে এবং পুলিশ অসহায় জনতার ওপর গুলি চালিয়েছে, যায় ফলে একটি সাঁওতাল রমণী আহত হয়। কোচবিহার জেলায় ৫ জন না খেয়ে মারা গেছে। প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলবেন যে, না খেয়ে মরেনি, রোগে মরেছে বা অন্য কোনও কারণে মরেছে। মানুষ দিনের পর দিন ক্ষুধায় থাকতে থাকতে তার যে অবস্থা ঘটে সেজন্য হয়ত তার মৃত্যু ঘটেছে। কাজেই চতুর্দিকেই এইভাবে ব্যাপক মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি থানায় বিনসিরা ইউনিয়নের মুসাফিদল হাঁসদা গত ১২ই জুলাই অনাহারে মারা গেছে, কাজ না পাওয়ার জন্য। আর হাঁসদার অন্ধ মাতা ও পাঁচটি পুত্রকন্যা অনাহারে মৃতবৎ হয়ে আছে। তপন থানার বাসতোরিয়া গ্রামে মোটা কিস্কু গত

৩রা জুলাই অনাহারে মারা গিয়েছে। আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও ইউনিয়ন বোর্ডের কাছ থেকে কোনও খয়রাতি সাহায্য পায় নি। ওই জেলায় পাণ্ডুয়া থানার শান্তিনগর কলোনিতে এক বৃদ্ধ অনাহারে আত্মহত্যা করেছে। থানার (পশ্চিম দিনাজপুরের) বৈকুণ্ঠপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরেন্দ্রনাথ জুলাইয়ে প্রথম সপ্তাহে অল্প বেতনের জন্য আত্মহত্যা করেন। এই অবস্থা সর্বত্রই চলছে। আর সরকার যাতে চালের দাম বেশি না বাড়ে তার জন্য মডিফায়েড রেশন ব্যবস্থা করেছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম রেশন শপের ব্যবস্থা করা হয়নি। নদীয়ায় গিয়েছিলাম সেখানে দেখলাম যদি বা রেশন শপের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো যাদের রেশন কার্ড কারা কোন দোকানে নেবে তার ব্যবস্থা হয়নি। তারপর কোনও রেশন শপে কার্ড নিয়ে গেলে চাল নেই, চাল চোরাবাজারে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে। সেদিক থেকে সরকারের এই মডিফায়েড রেশন থেকে সাধারণ লোকের চাল পাওয়ার উপায় নেই। তাই আজও যে তাদের দুঃখ তা এর থেকেই প্রমাণ হয়। তার ফলে দেখি ১৭ই জুলাই পশ্চিম দিনাজপুরে এবং মাটিয়াবাড়ি গ্রামে ৪০০ লোক খাদ্যশস্যের দোকানে ঢুকে দুই বস্তা গম লুট করে। চতুর্দিকেই লুটপাট শুরু হয়েছে। সাঁকরাইলে গত ১৯শে জুলাই খাদ্যের দাবিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন হওয়ায় রেশন ২-৩ মাস অন্তর দেওয়া হয় এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়াই হয় না। এই বাঁকুড়া বীরভূমে অনাহারের ছবি ভাল করে ফুটে উঠেছে। বীরভূমে একজন আত্মহত্যা করে। চালের দর যত বাড়ছে কৌটাও তত ছোট হচ্ছে এবং সেই এক কৌটায় যতটুকু চাল ধরে সেইটুকু খেয়ে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। রামপুর, নলহাটি, বোলপুর প্রভৃতি জায়গায় রেজিস্ট্রি অফিসে দেখা যায় যে, জমি বিক্রি বেড়ে গেছে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১২৬৭১টা জমি ছিল। এবার সে জায়গায় হয়েছে ১৮৩২৪টা। এই রকম একটা ভয়াবহ অবস্থা। অনেক জায়গায় এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে—চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

এক বন্ধু বলে গেছেন, উড়িষ্যা থেকে চাল আনা হচ্ছিল, উড়িষ্যায় চালের দর১৭ টাকা ১৮ টাকা। উড়িষ্যা থেকে চাল আনতে দশ আনা খরচ হয়। যদি সরকার সেখান থেকে আনে তা হলে সাড়ে আঠের আনাতে গরিব লোকদের চাল দিতে পারে।

তা না করে বেছে বেছে কতগুলি ধনী মাড়োয়ারিকে বাইরে থেকে চাল সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে তাঁরা বিক্রি করছেন তাতে লোককে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ ১৭ টাকা দরে চাল তাঁরা সেখান থেকে এনে লোককে সস্তায় দিতে পারতেন। মাদ্রাজে চালের দর ১৬ টাকা মণ। ডঃ ঘোষ

বললেন সেখানে ৫০ পয়সার চালান তারা বাড়িয়েছে। কাজেই সেখান থেকে ১৬ টাকা আর ১/০ আনা অর্থাৎ ১৭/০ আনা দিয়ে কিনে তার দোকানে যদি আরও ২ টাকা খরচ হয় তা হলে কম দরে নিশ্চয়ই তারা তা লোককে দিতে পারত। কিন্তু তা তারা দেবে না বলে যে সব লোকের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে, কন্ট্রাক্ট আছে তাদেরই হাতে এই সমস্ত চাল যাচ্ছে। এদিক থেকে দেশকে বাঁচাতে, দেশের খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াতে ওদের কোনও চেষ্টাই নেই। দিনাজপুর, নদীয়া ইত্যাদি জায়গায় কোনও কিছুই নেই। সুতরাং আজ আর মানুষের বাঁচার কোনও উপায় নেই, সেজন্য সংগ্রামে পুলিশের লাঠি গুলির সামনে দাঁড়ানো ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় নেই। এই বলে আমি শেষ করলাম।

২৬ জুলাই, ১৯৫৮।

উদ্বাস্তুদের জন্য

স্পিকার মহোদয়, আজ ১১ বৎসর ধরে আমাদের বঙ্গদেশে প্রতি বৎসরই, এই অ্যাসেম্বলিতে এবং তার বাইরে, আমরা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে আসছি, এবং উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে, আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকার যাতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করে সেই চেষ্টা আমরা করেছি। গত জানুয়ারি মাস থেকে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল—সে আন্দোলন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে নয়। দন্ডকারণ্যের উন্নতি হোক, দন্ডকারণ্যে লোক যাক এবং সেখানে বাণিজ্য গড়ে উঠুক সে সম্বন্ধে আমাদের কারও আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে দুরবস্থা তা দূর করার জন্য এখানে শিল্পের সম্প্রসাণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান দেখতে চাই। উদ্বাস্তু সমস্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মধ্যে আজ সরকারী নীতির কারণে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়শ উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতে পারলেই যেন আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—যেন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই রকম ছবি সরকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। উদ্বাস্তুর কথা ছেড়েই দিলাম, যে সমস্যা রইল—সে সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কী করেছে সে সম্বন্ধে একটি কথাও নেই। সরকার আমাদের সম্বন্ধে বলে, আমরা খালি সভা করি, আন্দোলন করি, কিন্তু কার্যকর কোনও প্রস্তাব দিতে পারি না। সেইজন্য ইউ-সি-আর-সি থেকে বিশেষ প্রস্তাব করে সরকারের কাছে একটা লিখিত প্ল্যান দিয়েছি আমরা। তাতে আমরা যা বলেছি আজ সরকার তা স্বীকার করেছে যে এর খানিকটা মূল্য আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার একথাও বলছে, ইউ সি আর সি একটা প্রস্তাব আমাদের কাছে দিয়েছে কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার যে কথা প্রচার করছে এবং তারা যে সার্ভে করেছে, যদিও তাদের জমির সেই সার্ভের ব্যাপারে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই না, কিন্তু তার মধ্যেও যে ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিশেষত এই হাউসে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রীরা বাংলাদেশের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা ভাবে নানা কথা বলেছেন, কখনও দশ লক্ষ একর, কখনও ২০ লক্ষ একর, কখনও ১ লক্ষ, আবার কখনও বা দেড় লক্ষ একর। কাজেই আমাদের সরকারের কথায় সন্দেহ হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে কালচারেবল ও আনকালচারেবল ল্যান্ড দেড় লক্ষ একরের বেশি নেই। সেইজন্য আমরা বলতে

চাই সরকার যখন আমাদের প্রস্তাবটা কনস্ট্রাকটিভ বলে গ্রহণ করেছে তখন আমরা চাইছি মনোভাব যার যাই থাক—এ বিষয়ে আমরা এবং সরকার এক সঙ্গে মিলে যাতে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর, সকলেরই পুনর্বাসন হয় সে বিষয়ে একটা প্ল্যান তৈরি করতে। সেদিক দিয়ে ইউ সি আর সির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাদের জানাতে চাই যে তারা যে নোট দিয়েছে সে নোট আমরা পুরাপুরি অগ্রাহ্য করতে চাই নি। এবং আমরা যে নোট দিয়েছি সেটাও সরকার একেবারে অগ্রাহ্য করেনি। কাজেই দুটি নোট এক সঙ্গে বসে বিবেচনা করে যাতে আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

পশ্চিমবাংলার সমস্ত চাষী জমি পায়নি। তাহলে কি তাদের সবাইকে পশ্চিমবাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবেন? আমাদের কাছে যে সংখ্যা-তথ্য এসেছে তাতে ১৪ লক্ষ লোকের জমির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কাজেই ইন্ডাস্ট্রির সাহায্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্ল্যান দিয়েছি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান প্রিজাম্পশান বলে সে কথার কোনও মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। আমরা সেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, যে সরকার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি করেছে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলি যে সম্পূর্ণ প্রিজাম্পশান একথা কেউ বলতে পারবে না। আমরা বলেছি সুগার মিল নিয়ে ধুবুলিয়া ক্যাম্প করতে। কারণ সেখানে যে হাজার হাজার রিফিউজি আছে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তার দ্বারা হতে পারে। এ ছাড়া newsprint wood pulp factory in North Bengal, caffine factory in North Bengal, paper mill in Garbeta, a factory for manufacture of pulp etc. করার জন্য আমরা প্ল্যান দিয়েছি। আমাদের এই প্ল্যানগুলি দেখে কেউ বলবেন না যে এইগুলি প্রিজাম্প শান। আমরা ইউ সি আর সি থেকে জমি ও ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে যে নোট বা প্ল্যান দিয়েছি তাতে খালি উদ্বাস্তুরাই লাভবান হবে না, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণও লাভবান হবে। উদ্বাস্তু সমস্যার আগে পশ্চিম বাংলার গ্রামের অবস্থার কথা একবার চিন্তা করুন। সেখানে ম্যালেরিয়া, বাঘ ও সাপের আড্ডা ছিল। উদ্বাস্তুরা আসার পর থেকে আমি নিজে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি গ্রাম ঘুরে অনেক জায়গায় উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিয়েছি। নদীয়া জেলায় পাটকেবাড়ি বলে একটা জায়গায়, যেটা বহুদিন ধরে জলের মধ্যে ডুবে ছিল, সেই জায়গায় আমি আর তারকবাবু গিয়ে সেখানে উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিয়ে এসেছি এবং এখন তারা সেখানে সোনার ফসল ফালাচ্ছে।

স্পিকারের প্রশ্ন : কোথায়?

নদীয়া জেলায় পাটকেবাড়ি। আমার আর সময় বেশি নেই বলে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলতে পারলাম না। অনেক স্কোয়াটাররা মুসলিম হাউসে বসতেন, তাঁদের অনেক জায়গা জমি নিয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি করেছেন। কিন্তু খড়দহে দেশগৌরব বলে একটা কলোনি হয়েছে—সরকার থেকে এখন পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোনওরকম ল্যান্ড পারচেজিং লোন বা হাউস বিল্ডিং লোন কোনও কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। নদীয়া জেলায় কন্ট্রিবিউটার স্কিমে অনেকে বাড়ি তৈরি করেছেন কিন্তু হঠাৎ সেই কন্ট্রিবিউটারি স্কিম বদলে দেওয়াতে শক্তিনগরে বাড়িগুলো অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে। টি বি গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এগজামিন করে মেডিক্যাল বোর্ড থেকে টি বি গ্রান্ট দেবার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। আন্দোলনে করে একটা ছেলে জেলে গিয়েছে, অমনি তার ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা কি চাপ দেওয়া নয়, যাতে তারা দন্ডকারণ্যে যায়? কাজেই এই যে সমস্ত নীতি দেখছি তাতে আমরা এর সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯।

এই মন্ত্রিমন্ডলী নিপাত যাক

কলকাতার এবং পশ্চিম বাংলার খাদ্য আন্দোলন দমনের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। দেশের দুস্থ, দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তদের ন্যায্য ও সস্তা দরে চাল দিতে এই মন্ত্রিমন্ডলী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মজুতদারদের অবাধ অধিকার দিয়ে তাদের ইচ্ছামতো চড়া দরে চাল বিক্রয় করার সুবিধা দিয়েছে। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য এত অধিক হয়েছে যে সাধারণ মানুষ তা ক্রয় করতে পারছে না। ৩১আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর খাদ্য আন্দোলনকারীদের পুলিশ লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করেছে ও বহু লোককে গুলিতে আহত ও নিহত করেছে। যদিও সরকারের গদি দখল করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, সরকারকে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মানানোই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পুলিশ খাদ্য আন্দোলন দমনের জন্য যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে বহু নির্দোষ নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশুকে হত্যা করেছে।

পুলিশের পাশবিক তান্ডব অসহায় মানুষকে হিংসামূলক প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করেছে। পুত্রের হত্যা বৃদ্ধ পিতার বুকে, স্বামীর হত্যা স্ত্রীর বুকে, পিতৃহত্যা সন্তানের বুকে এবং নারীর নির্যাতন ও ধর্ষণ জনসাধারণের মনে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জমিয়েছে। হাওড়ার কোনও কোনও গ্রামে প্রতি গৃহ থেকে নিরীহ লোকদের টেনে এনে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পন্ডিত নেহরু আমাদের অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যে ভয়ানক কান্ড কলকাতা শহরে এবং হাওড়ায় ঘটে গেল, এতগুলি লোক হত হল, এতগুলি লোক লাঠির ঘায়ে মারা গেল ও জখম হল, সেখানে তাঁর মুখ থেকে একটা সহানুভূতির কথাও আমরা শুনতে পেলাম না। তিনি ভারতবর্ষের একজন সম্মানীয় নেতা। কংগ্রেসের উর্ধে উঠে, এই শাসন-ব্যবস্থার উর্ধে উঠে তাঁর কথা বলা উচিত ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর অজিত বিশ্বাস বলে একজন লোক একটা পত্র লিখে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিল ঃ

Whether it is a fact that on the midnight of the 3rd September some registered head bodies of those who became martyrs in this Food Movement were carried to the Keoratolla Burning Ghat under the control of the Deputy Commissioner, Mr. Bagchi with the help of hundreds of constables and were burnt to ashes in the electric cremation oven?

এতগুলি লোককে ডেপুটি কমিশনার মিঃ বাগচি, ৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে কয়েকশত পুলিশ দিয়ে সেই দেহগুলি ক্রিমেশন গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক ওভেনে পুড়িয়েছে কিনা। সেখানে রেজিস্ট্রারের আপত্তি ছিল, কারণ সেখানে রেজিস্ট্রি না করে পোড়াবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু ওপর থেকে হুকুম দেবার পর তিনি বাধ্য হয়ে সেই বডিগুলিকে পোড়াতে বলেন। এর সঙ্গে একজন কৃষক মহিলাকে তারা ফেলে রেখে গিয়েছিল এবং সেই পরে এই সংবাদ প্রকাশ করে। মন্ত্রীরা এই অমানবিক পাশবিকতার তান্ডবকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে তাঁরা দুর্নীতি দমন করতে সম্পূর্ণ বিফল হয়েছেন।

তাছাড়া পাবলিক হেলথ বিভাগের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। কিন্তু আমরা শুনলাম যে, সেটা চেপে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কল্যাণীর কথা অনেকবার এখানে আলোচনা হয়েছে। কল্যাণীর বাড়িগুলি ফেটে যাচ্ছে এবং এখানে অন্যতম কয়েকজন বিভাগীয় কর্মচারী তাদের যে ৭ ইঞ্চি করে পয়ঃপ্রণালীর কংক্রিট করার কথা ছিল তা করেনি। সেখানে ফাঁকি দিয়ে তারা প্রায় ২/৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে।

কল্যাণীতে উন্নয়ন বিভাগের দুজন কর্মচারী মহিলাদের প্রলুব্ধ করে যখন গভর্নমেন্টের গাড়ি করে বেড়াচ্ছিলেন তখন জনতা কর্তৃক প্রহৃত হয়েছিলেন। এই অভিযোগ সরকারের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছে। আনন্দবাজারেও এটা বেরিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। এই সমস্ত কাজের জন্য দুর্নীতি বিভাগের সুযোগ্য অফিসার নবগোপাল দাশ পদত্যাগ করে চলে গেছেন। সরকার জমিদারি বিলোপ করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করছে কিন্তু উদ্বৃত্ত জমি চাষীর হাতে দিচ্ছে না। সমস্ত জমি জমিদাররা নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিয়েছে এবং সরকার তা সমর্থন করে চলেছে। কাজেই চাষীর হাতে জমি না গেলে, চাষীদের উপযুক্ত সার, ঋণ ও ভাল বীজের ব্যবস্থা না করে দিলে কী করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হবে? খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জল নিকাশের ব্যাপারে জলসেচের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। চারিদিকে জলপ্লাবন হয়েছে, লোকের ঘরবাড়ি ডুবে গেছে, ১০০ কোটি টাকা খরচ করেও সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি কর্মচারী নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং তাদের ভাতার দাবির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবহন বিভাগের এবং হাসপাতালের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দাবি অনুসারে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১২ লক্ষ বেকার এবং ৮ লক্ষ অর্ধ বেকার রয়েছে। এদের সমস্যা সমাধানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক বাঙালি নিয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে। ডিগ্রি কোর্সের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, স্কুল কলেজের

অভাব রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।অত্যধিক দুর্নীতি চলছে, সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার বা সহানুভূতি পায় না। সাধারণ মানুষের কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিপুল অত্যাচার ও রক্তের স্রোত এই সরকার বইয়ে দিয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্মল ফ্যাক্টরিজ ইউনিয়নের সনাতন মন্ডলকে ভীষণভাবে প্রহার করতে করতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোদপুরে শচীন সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে অত্যধিক প্রহার করেছে। বেলঘরিয়ায় যা ঘটেছে তা থেকে আমাদের মনে হয় ইংরেজ রাজত্বে শাসকরা বিপ্লবীদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করত খাদ্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গেও সেরকম ব্যবহার এরা করছে। মানুষকে গ্রেপ্তার করলেই দোষী সাব্যস্ত হয় না। যতক্ষণ না তার বিচার হচ্ছে, দোষী বলে সাব্যস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য মন্ত্রীরা পুলিশকে অবাধ অধিকার দিয়েছেন। পুলিশ কমিশনারই সমস্ত কান্ডের জন্য দায়ী,অথচ সরকার এই সমস্ত কাজের এনকোয়ারি করার জন্য তাঁর ওপরই ভার দিয়েছে।

এঁদের ছাড়া কী আর কোনও লোক নেই? যারা ভাল লোক, নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তাঁদের এই কাজের জন্য নেওয়া উচিত। হাওড়ায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি হাওড়ায় এই সমস্ত চালিয়েছেন, তাঁর ওপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছে। এরকমভাবে সরকারি লোকের ওপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়ায় তাদের ওপর জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং জ্যোতিবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, এই মন্ত্রিসভার ওপর অনাস্থা জানিয়ে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি বলতে চাই, এই মন্ত্রিমন্ডলী নিপাত যাক।

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, পরপর দুবার—এই বিধান সভা থেকে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করার পরেও আজ কংগ্রেস সভ্যদের যে বক্তৃতা শুনছি তা অত্যধিক লজ্জা ও আশ্চর্যজনক। বাস্তবিক, সরকারের বিবরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা যে কতখানি সঙ্গত তা তাঁদের বক্তৃতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা যে প্রস্তাবের ওপর দুবার মত দিয়েছেন, সেই অ্যাসেম্বলি প্রস্তাবের কি কোনও দাম নেই? এই হাউসের সদস্যরা তাঁদের সেই নেতৃত্বের ওপর কোনও আনুগত্য দেখাচ্ছেন না বা কোনও মর্যাদা তাঁরা দিচ্ছেন না। সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পন্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত মর্যাদাকে বড় মনে করছেন। দেশের জনসাধারণ ও জনমতের প্রতি তাঁদের কোনও শ্রদ্ধা নেই। জনমতকে তাঁরা কোনও মূল্য বা দাম দিচ্ছেন না। সেদিক থেকে আমি মনে করি, এঁরা যে বক্তৃতা করছেন, তা সম্পূর্ণ এই আইন পরিষদে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তার বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন সভায় গৃহীত সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ না করে তার বিরুদ্ধে কাজ করায় এই অ্যাসেম্বলি ও জনসাধারণের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তার ফলেই তাদের বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা সম্পূর্ণ মানবিক। কাজেই সেদিক থেকে এই অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে। আপনারা সকলে জানেন গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সংবিধানের কথা বলা হয়েছে। নেহরু-নুন চুক্তিতে যদি বেরুবাড়িকে সংবিধান ও গঠনতন্ত্র অনুসারে দেওয়া যেত তাহলে তাঁরা দিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁরা সংবিধানের কথা তুলতেন না। যেহেতু বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে একটা বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেই হেতু সরকার বাধ্য হয় এই ব্যাপারটা সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যেতে। আপনি জানেন স্যার, অধ্যাপক নির্মল বসু মহাশয় হাইকোর্টে প্রথম এই বেরুবাড়ি প্রশ্ন নিয়ে যান এবং তারপরে এটা সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেদিক থেকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্পূর্ণ গণতন্ত্র ও সংবিধান সম্মত। যেকথা কংগ্রেস সদস্যরা বলছেন—তা আমি মনে করি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

কংগ্রেস সদস্যদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল ও অযৌক্তিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বেরুবাড়িকে দেওয়া হয়েছে সংবিধানকে সংশোধন করে। কিন্তু তার আগে যে নেহরু-নুন চুক্তি হয়েছিল, সেটা যে সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সংবিধান বিরোধী তা সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তা না হলে আমাদের সংবিধানকে সংশোধন করতে হত না। সেইজন্য আমি বলব সংবিধানকে সংশোধন করে যে বেরুবাড়ি হস্তান্তর

করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ, যুক্তিসঙ্গত নয় এবং এটা জনস্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্বন্ধে যখন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে বারবার বলেছেন যে, তিনি বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন এবং এর বিরোধিতা ভবিষ্যতেও করবেন। ৩রা সেপ্টেম্বর অধ্যাপক নির্মল বসু মহাশয় বেরুবাড়ির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং ডাঃ রায় সেখানে পরিষ্কার বলেন যে তিনি বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এই কথা তিনি প্রফেসার নির্মল বসু মহাশয়কে বলেন। তারপর হঠাৎ কী ভাবে তাঁর মত পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি যে কথা বারবার এই অ্যাসেম্বলি কক্ষে বলেছেন, যার প্রতিবাদ করে চিঠিপত্রে জানিয়েছেন এবং অধ্যাপক নির্মল বসুকে যে কথা বলেন,—হঠাৎ তাঁর সেকথা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন না এই আইন পরিষদের প্রস্তাবের কথা। তিনি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনি তা ভাবলেন না। প্রফেসার নির্মল বসু ও বেরুবাড়ির প্রতিনিধিদের সামনে তিনি যে কথা বলেছিলেন, সেকথা একদম ভুলে গেলেন। কাজেই সেদিক দিয়ে বেরুবাড়ি হস্তান্তরটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের জনমতের বিরোধী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে সবার হয়ে, আমি বেরুবাড়ি হস্তান্তর যে ভাবে করা হয়েছে, যেটা আইন করা হচ্ছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি এবং যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেটা আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।

এই আইন পাস হবার পর আমি বেরুবাড়িতে গিয়েছিলাম। বেরুবাড়ির লোকেরা হাজারে হাজারে সেখানে সমবেত হয়—তাদের দৃঢ় মন নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ভারত সরকার সংবিধানকে সংশোধন করে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করে দেবে। কিন্তু বেরুবাড়ির মানুষ সে প্রস্তাব মানবে না। তারা এর জন্য নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত। তাই তারা সংকল্পবিধি তৈরি করেছে এবং তাতে নিজেদের রক্তের অক্ষরে লিখেছে—'আমরা রক্ত দেব তবু বেরুবাড়ি দেব না'। একজন ৮১ বছরের বৃদ্ধের কাছে রক্ত চাওয়া হয়—এটা তার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেরুবাড়ির জনসাধারণ বেরুবাড়ি হস্তান্তর হতে দেবে না। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে, যে সমস্ত কথা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে বা সার্কুলেটেড হয়েছে, যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বা তাঁর সচিব বা তাঁর গভর্নমেন্টের অফিসারগণ শ্রী এস. এন. চ্যাটার্জী বা শ্রী আর. এন. চ্যাটার্জী বা রঘু ব্যানার্জী—তাঁরা যে ভাবেই বেরুবাড়ি হস্তান্তরের ব্যাপারে সাহায্য করুন না কেন, তাঁদের কাজ যে খুবই নিন্দনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের কাজ এবং গভর্নমেন্টের কাজ ও ডাক্তার রায়ের কাজ আলাদা নয়। কারণ, তাঁরা

যদি ডাঃ রায়ের মতের বিরুদ্ধে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতের বিরুদ্ধে কাজ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাদের উপযুক্ত শাস্তি হত। কিন্তু তা করা হয় নি।

তাঁরা যে একসঙ্গে যোগসাজসে বেরুবাড়ি হস্তান্তরকে সমর্থন করেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে সব যুক্তি কংগ্রেস পক্ষ থেকে দেওয়া হল, যে সব বক্তৃতা দেওয়া হল তাতে বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হল না। বেরুবাড়ি হস্তান্তর কতটা অন্যায় অযৌক্তিক তা বলা হল না। কাজেই আপনাদের আনুগত্য, দেশের প্রতি এবং ভোটারদের প্রতি, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? তবে যদি বলেন একটা কেন্দ্রে নির্বাচন হয়ে গেছে। সুতরাং বেরুবাড়ি প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে, এরকম যদি যুক্তি দেন তাহলে সেটা ছেলেমানুষি যুক্তি। এর কোনও দাম নেই। আমরা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে বলেছিলাম, আটকাতে পারেন যদি—পদত্যাগের হুমকি দিন। আমাদের বিরোধীপক্ষের সদস্যদের বলা হয়, আপনারা পদত্যাগ করুন। আমরা কেন পদত্যাগ করব? আমরা তো জনমতকেই সমর্থন করেছি। আমরা তো বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছি। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং আমরা উভয়ে পদত্যাগ করে জানাব যে যদি হস্তান্তর করা হয় তাহলে সারা বাংলাদেশ একত্রে বিরোধিতা করবে। কাজেই সেদিক থেকে তাদেরই পদত্যাগ করা উচিত। কেননা আইন পাস করে কংগ্রেস সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলেন। তাঁরা হস্তান্তরের বিরোধিতা করে একটা নজির সৃষ্টি করুন এটা আমরা চেয়েছিলাম। পদত্যাগ আপনাদেরই করা দরকার। আমরা সকলে মিলে পদত্যাগ এজন্য করতে চেয়েছিলাম কারণ একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করে পন্ডিত নেহরুকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে বাংলা যদি ভাগ কর তাহলে বাংলাদেশ তোমার সঙ্গে থাকবে না। আমি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ঘুরে দেখেছি সেখানকার মানুষের যে কি মত, বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরূদ্ধে তাদের কি সংকল্প তা আপনার কাছে পড়ে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ২৬শে জানুয়ারি ঐতিহ্যমন্ডিত স্বাধীনতা দিবস ও ভারতের সংবিধান গ্রহণের দিন, সাধারণতন্ত্র দিবস।

অদ্য ২৬শে জানুয়ারি ১৯৬১—বেরুবাড়ি রক্ষা সংকল্প দিবসে "আমি বেরুবাড়ির অধিবাসী নিজের রক্ত দিয়া স্বাক্ষর করিয়া এই সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে সকল প্রকার. ন্যায় নীতি জনমত গণতন্ত্রের আদর্শ বিসর্জন দিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সরকার যেভাবে পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তরের চেষ্টা করিতেছেন, আমি সর্বতোভাবে তাহাতে বাধাদান করিব।

আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমি ভারতের নাগরিক এবং সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগের আমি অধিকারী। কোনও চুক্তি বা আইনের দ্বারা

এই অধিকার হরণ করা যায় না। বেরুবাড়ি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহা ভারতেরই থাকিবে।

ভারতের নাগরিকরূপে ভারতের অখন্ডত্ব নাশের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়া আমার পবিত্র কর্তব্য। আমি জন্মভূমির নামে শপথ করিতেছি যে কেন্দ্রীয় অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেরুবাড়ি হস্তান্তরের জন্য যে চেষ্টাই করুন না কেন আমি শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহা প্রতিরোধ করিব।

বেরুবাড়ির পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কল্প-বেদীর সন্মুখে দাঁড়াইয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়াও আমি এই সঙ্কল্প-বেদী রক্ষা করিব।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১।

বাস্তব পরিস্থিতি, অবাস্তব বাজেট

স্যার, যে পরিস্থিতিতে বাজেট এসেছে এবং বাংলাদেশ আজ যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তাতে ঠিক চিত্র এই বাজেটে আঁকা হয় নি। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই। ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা, স্ট্যাটিসটিশিয়ানরা যে ফিগার তৈরি করে দেন, তাঁরা যে খবর দেন, সেই অনুসারে বাজেট তৈরি হয়। কাজেই বাজেটের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনও সম্পর্ক কোনও যোগাযোগ নেই। আমি দেখতে পাই এবং শুনছি ও বাজেটে দেখছি; বলা হচ্ছে শিল্পের উন্নতি হয়েছে, কৃষির উন্নতি হয়েছে, আমাদের শিক্ষার উন্নতি হয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যদি গ্রামে গ্রামে ঘুরি তাহলে সম্পূর্ণ পৃথক চিত্র সেখানে ফুটে উঠেছে। কাজেই বাজেটের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনও সম্পর্ক , কোনও যোগাযোগ নেই। দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে। যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে বেকার সমস্যার দিক থেকে যে আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পনা করা হচ্ছে না। অন্যান্য দেশে যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেই সমস্ত পরিকল্পনা ক্রমবর্ধমান জনতা এবং তদানীন্তন অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে। তার ফলে সে দেশের উন্নতি হয়েছে। কৃষির উন্নতি হয়েছে, শিল্পের উন্নতি হয়েছে, বেকার সমস্যা কমেছে। কিন্তু আমাদের আয় কমছে ব্যয় বাড়ছে। তাই আমরা দেখছি বাজেটে ঘাটতি ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ঘাটতির ব্যাপারে ভয় পাবার কিছু নেই। যদি যে সমস্ত সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে সেগুলি সমাধানের পথে আমরা যাই, তাহলে আমাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু অনবরত ঋণ করা হচ্ছে। নানারকম শিল্প প্রচেষ্টা হচ্ছে এবং জিনিসপত্রের উৎপাদন কিছু বেড়েছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, বেদনা, অভাব কমে নি। বেকার সমস্যা কমেনি। সেইজন্য দেশের আর্থিক উন্নয়ন যা বাজেটে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে এই দেশের প্রকৃত চিত্রের যোগাযোগ নেই। কাজেই সে দিক থেকে যে সমস্ত চিত্র দেখানো হয়েছে যে আমাদের ১৯৬০-৬১ সালে রাজস্ব আয়ের সংগৃহীত হিসাব ৪,০০,৫০,০০,০০০ টাকা ছিল, ১৯৬১-৬২ সালে আনুমানিক প্রায় ৩,৫৯,২৭,০০,০০০ টাকা রাজস্ব আয় হচ্ছে। এইভাবে কেন কমছে? এই বিষয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া নিশ্চয়ই দরকার। এই আলোচনার মধ্যে বৈচিত্র আরও ফুটে উঠেছে। রেল ভাড়া থেকে রাজ্য সরকার যে কর আদায় করে তার পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের সংগৃহীত হিসাবে ৮৭ লক্ষ টাকা। আর ১৯৬১-৬২ সালে আনুমানিক আয় হল ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। এই আয় কেন

কমল এটা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান হওয়া দরকার। ঠিক এই ভাবে রাজস্ব কমেছে আবগারি শুল্ক বাবদ আয়ে। চারিদিকে চোলাই মদের কারখানা বেড়েই চলেছে। অথচ আয় কেন কমছে?

আগের কর্মচারী, তারা নিশ্চয়ই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। তারা এই চোলাই মদ ধরছে না। কাজেই চোলাই মদের উৎপাদন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদিকে থেকে ১৯৬০-৬১ সালে গৃহীত আয় ছিল ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, আর ৬১-৬২ সালে আনুমানিক আয় হচ্ছে ৬ কোটি ৯৬ হাজার টাকা। রাজকোষে আয় বাড়ছে না। কিন্তু বিক্রয় ঠিকই হচ্ছে। দিনের পর দিন গলিতে গলিতে এই সব ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ছে। যানবাহনের ওপরও আদায়কৃত করের পরিমাণ কমেছে। কেন এই রাজস্ব কমে যাচ্ছে? যানবাহনের সংখ্যা কি কমে যাচ্ছে? ১৯৬০-৬১ সালে আয় ছিল ২ কোটি ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; ১৯৬০-৬১ সালে সগৃংহীত হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ২ কোটি ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের আনুমানিক আয় হচ্ছে ২ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। সেলস্ ট্যাক্স বাবদ আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারের আয় বেড়েছে। এটা সত্য কথা। কিন্তু এর গতি অত্যন্ত কম। যেভাবে সেলস্ ট্যাক্স আদায় হওয়া উচিত ছিল সেই ভাবে সেলস্ ট্যাক্স আদায় হয় নি। এবং যে ভাবে সেলস্ ট্যাক্স ফাঁকি যাচ্ছে সেইগুলি ধরার বিশেষ কোনও চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। রাজ্যের অর্থিক উন্নতি না হলে বড় লোক বা গরিব কারোরই কোনও উপকার হবে না। সরকারের অযোগ্যতা প্রতিফলিত হয় তার রাজকোষে। আমরা যদি এই রাজকোষের প্রতি দৃষ্টি দিই তাহলেই এই সরকারের চরিত্র বুঝতে পারব। এই রকম অবস্থা দেখতে পাচ্ছি চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বাবদ আয়ের বরাদ্দ কমেছে। চিকিৎসা খাতে ১৯৬০-৬১ সালে ব্যয়ের সংগৃহীত হিসাবে হচ্ছে ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে এই খাতে বরাদ্দ কমে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। জনস্বাস্থ্য খাতে ১৯৬০-৬১ সালে সাধারণ হিসাব থেকে দেখতে পাই ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, ১৯৬১-৬২ সালে তার পরিমাণ কমে দাড়িয়েছে ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। অথচ পুলিশের খরচের বেলায় বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে প্রকৃত হিসাব ৮ কোটি ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার, সাধারণ হিসাবে ৮ কোটি ৪১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, এবং ১৯৬১-৬২ সালের বরাদ্দ হচ্ছে ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। কাজেই এই জনকল্যাণ সরকারের আসল রূপ এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তারপর শিক্ষা বিভাগে দেখছি সিক্রেট সার্ভিসের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যদি এরকম করে সিক্রেট সার্ভিসের জন্য টাকা দেওয়া হয়

তাহলে আমাদের নৈতিক চরিত্র কত যে নীচে নেমে যাচ্ছে তা তো বোঝা যাচ্ছে। তারপর স্যাটেলাইট টাউন করে বহু লোকের বসবাসের ব্যবস্থা হবে—কলকাতা অত্যধিক জনবহুল হয়ে পড়েছে, আর লোকের জায়গা হয় না। কাজেই কলকাতার আশপাশে জমি সংগ্রহ করে সেই জমিতে নতুন শহর গড়ে তোলা হবে। তার মোট এলাকার পরিমাণ ১৬০ স্কোয়ার মাইল। মোট জমি হল ৪৮ হাজার ৫০০ একর, বাস্তু জমি ৮ হাজার ৪৮০ একর, ধান জমি ১ লক্ষ ৮০ হাজার বিঘা। প্রতি বৎসর ধান নষ্ট হবে ১০ লক্ষ ৮ হাজার মণ। বাস্তুচ্যুত হবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার লোক। নতুন উপনগরী গড়ে তোলা সম্পর্কে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা দেখি সরকার যা কিছু প্ল্যান আনে এবং সেই প্ল্যানিং অনুসারে যে কাজ করে তাতে লোকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বলা হয়েছে তাদের ঋণ দেওয়া হবে, ঘরবাড়ি দেওয়া হবে, তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা করা হয় নি। যে সমস্ত লোক বাস্তুচ্যুত ও জীবিকাচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য কোনও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় নি। এদিকে আমি বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে যেন তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ না করা হয়। আমার মনে হয় যে প্ল্যানিং করা হয়েছে তার কিছু অদলবদল করে যদি কলকাতায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে একদিকে যেমন বাস্তুজমির ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে তেমনই তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। তারপর এই পরিকল্পনার অর্থবরাদ্দ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্ল্যানিং কমিশনের মধ্যে মতভেদ এই বাজেটে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একথা ঠিক যে, ভারতের উন্নয়নের পরিকল্পনাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা কমিশন এদিকে লক্ষ্য রেখেই কার্যে অগ্রসর হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি বলব পশ্চিমবাংলার প্রতি ন্যায় বিচার করা হয়নি। জুটের অর্থাৎ পাটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ইনকাম ট্যাক্সে যে টাকা আদায় করে, তার যে যোগ্য অংশ আমাদের পাওনা ছিল তা আমরা পাইনি। এই ব্যাপারে আমি আমার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখছি।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১।

গ্রেপ্তার হচ্ছে না কেন?

লোক দেখানো গোছের দু-চার জন ছোট ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হলেও, বড় বড় ব্যবসায়ীদের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে না। ভারতরক্ষা আইনে এদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? আমরা এ কথা স্বীকার করি, দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে, স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে সরকারের হাতে জরুরি অবস্থার বিশেষ ক্ষমতা থাকা উচিত এবং যারা দেশদ্রোহী তাদের বিনা বিচারে আটক রাখাও চলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ জরুরি অবস্থায় নির্বাচন করা সঙ্গত কিনা? নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রয়োজন তা জরুরি অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। আপৎকালে দেশদ্রোহীদের বিনা বিচারে আটক রাখা সঙ্গত, কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকার নির্বাচনে বিরোধীপক্ষীয় যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক বন্দির প্রশ্ন নয়, জরুরি অবস্থায় সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারও সঙ্কুচিত। গণতন্ত্র মানে কতগুলি প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান মাত্র নয়, এ এক পরিবেশ যেখানে সকলেই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারবে এবং সেই মতো কাজ করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে চীনা আক্রমণ ও তজ্জনিত জরুরি অবস্থায় যে গুমোটের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এই পরিবেশ বা আবহাওয়া কোথায়? সরকারের প্রতিরক্ষা নীতির দুর্বলতার সমালোচনা করা চলবে না—তাহলেই ভারতরক্ষা আইনের ভয়। অথচ সরকারি দল কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ট্যাক্সের বিরুদ্ধে যখনই বলবেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার অভিসন্ধি। সাধারণ মানুষ সরকারের সমালোচনা করতে ভয় পায়। ভারতরক্ষা আইনের বিভীষিকার মধ্যে কোনও স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নয়। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে হলে জরুরি অবস্থা ও ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহার করতে হবে, এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এনে বিচার করতে হবে। যাদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং অন্যদের ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু জরুরি অবস্থা তোলার মতো সময় কি উপস্থিত হয়েছে? সরকারকে স্থির করতে হবে, জরুরি অবস্থা থাকবে, না নির্বাচন হবে? দুটো এক সঙ্গে হতে পারে না। সরকার আজ স্পষ্টই পরস্পর বিরোধী আচরণ করছে। আমাদের বক্তব্য, জরুরি অবস্থা বর্তমানে প্রত্যাহার করা উচিত নয়। স্বাধীনতার বিপদ এখনও কাটে নি। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও চীনা হানাদাররা বসে রয়েছে। তাছাড়া চীন যে কোনও সময়

আক্রমণ করতে পারে। চীনের মতিগতি মোটেই ভাল নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় দেশরক্ষার প্রয়োজনে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং জরুরি অবস্থা বজায় রেখে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা চালু রাখার কথা যদি আমরা স্বীকার করি, তবে এ অবস্থায় নির্বাচন করা চলে কী করে? তাই আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, জরুরি অবস্থা থাকাকালীন সময়ে নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে সকল উপ-নির্বাচন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হোক।

২৯ মার্চ, ১৯৬৩।

আগে ভারতের নাগরিক

সভাপাল মহোদয়, শ্রীঅশোক দত্ত মহাশয় এখানে রাজ্যপালের ভাষণ সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সামনে আঁকলেন—ফ্যাক্টস-ফিগারস-এর উপর ভিত্তি করে এই যে চিত্র আঁকলেন তাতে আমি বুঝতে পারছি না যে, রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে কিনা। যে সমস্ত সমস্যা আমাদের দেশের সামনে রয়েছে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোনও পথ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নিশ্চয়ই খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকার-সমস্যা—এই সমস্ত সমস্যাগুলির যাতে সমাধান হয়, সেই রকম চিত্র আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই রকম কোনও চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি এবার রাজ্যপাল বলেছেন যে, আমাদের দেশে যে খাদ্য উৎপাদন হবে, তা হবে ৪৮ লক্ষ টন—৬ লক্ষ টন আউশ হবে এবং ৩ লক্ষ টন উড়িষ্যা থেকে আসবে। প্রত্যেক বছরই, যেমন গত বছরে রাজ্যপাল তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বললেন যে, মাত্র চার লক্ষ টন খাদ্যের অভাব হবে, অথচ দেখলাম শেষকালে বাইশ লক্ষ টন খাদ্যের অভাব হয়ে গেল। কাজেই এই যে রাজ্যপাল আমাদের সামনে খাদ্য অর্থাৎ ধানের যে চিত্র আঁকলেন সেটা যে কতখানি বাস্তব তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের মনে আছে যে, যতই দিন যাচ্ছে ততই দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে। বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে। খাদ্যের সমস্যা আরও দিন দিন গভীর জটিল হয়ে পড়ছে। সরকার যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিল এখন সেখানে তারা ভাবছে যে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি ইত্যাদি নানারকমভাবে সেদিক থেকে তার কোনও পরিবর্তন করা যায় কি না। কাজেই সেদিক থেকে কোনও পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে রাখা হয়নি। এটা ঠিক যে, মানুষের সবচেয়ে দরকার যেটা সেটা হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা। হাসপাতাল বাড়ছে ঠিক। কিন্তু যে অনুসারে রোগ আমাদের দেশে তার প্রতিকার আছে তেমন ব্যবস্থা নেই। যেমন প্রায় আট লক্ষ লোক যক্ষ্মায় ভুগছে। আর রোগের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে জায়গা হয় না। আপনি স্যার, মেডিক্যাল কলেজে যান বা যে কোনও হাসপাতালে যান সেখানে দেখবেন যে, রোগীরা গায়ে গায়ে শুয়ে আছে। এই অবস্থায় নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থার ইঙ্গিত এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই অশোকবাবু যে কথা উল্লেখে বলেছেন বা যে সমস্ত কথার তিনি উল্লেখ করেছেন তার কোনও কিছু আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি যে, পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাবিধ্বস্ত

উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছেন, তাদের সম্বন্ধে একটা প্ল্যানড রিহ্যাবিলিটেশনের কথা যেটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের জোর করে বলা দরকার ছিল, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে যে সমস্ত লোক এসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে তাদের কোনও ব্যবস্থা করার একটা ইঙ্গিত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তা নেই। তিনি নিশ্চয়ই বলবেন বলে আশা করেছিলাম যে, তাদের সেখানে থাকা কোনও রকমেই আর নিরাপদ নয়। তাদের সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। কাজেই একটা মাইনরিটিকে, একটা হিন্দুকেও সেখানে রাখা উচিত নয়, যেটা ভারত গভর্নমেন্ট দেশ বিভাগের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আজকে আপনারা দেখেছেন যে, কাশ্মীরে, একটা প্রশ্ন নিয়ে যা অশোকবাবু বললেন, যেটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সেটা বাংলাদেশের বিধান সভায় হবার স্থান নয়। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সমস্ত দেশ জড়িত, তার সঙ্গে সম্পর্কিত এই কাশ্মীর প্রশ্ন—সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থ তার সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর শান্তি এর সঙ্গে জড়িত। যে কথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলেছে, আমাদের ডিন সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে নীতি এতদিন চালিয়েছে সেই একই নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কাশ্মীর ও ভারত সম্বন্ধে চালাচ্ছে, সেই নীতির কিছুই বদলায় নি। ভারত বিভাগ হয়েছিল, তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ইন্টারভেনশনে কাশ্মীরকে পুরোপুরি দখল করতে দেওয়া হল না এবং অর্ধেক কাশ্মীর শুধু আজ ভারতবর্ষে রয়েছে। বলা হয়েছিল পরে মিটমাট করে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন এটা করা হয়েছিল? লর্ড মাউন্টব্যাটেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর খুব প্রিয় পাত্র এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাপ ছিল বলে কাশ্মীর দখল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল। আজ তাই সেদিক থেকে যখন আমার দেখছি নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বভাবতই তাদের সমর্থন করছে, এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমাদের উচিত নয় তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তাদের নীতি পরিচালিত করবে। সুতরাং আমরা যে কাশ্মীরের ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সমর্থন পাব না এটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা পরিচালিত, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। আজ এত বড় একটা কান্ড পূর্ব বাংলায় ঘটে গেল। কত হাজার লোক নিহত ও আহত হয়েছে , কত হাজার ঘরবাড়ি পুড়ল সে অবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিশেষ আলোচনা না করে এবং তার প্রকৃত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে তারা আজ এইভাবে কাজ করছে। কাজেই সেদিক থেকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে এই অ্যাডজর্নমেন্ট মোশনে আমি বক্তব্য পরিষ্কারভাবে রাখতে চাই। আজ আমি বলতে চাই, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে নন্দাজী যে কথা বলেছেন—আমরা

বাংলাদেশের তরফ থেকে সমস্ত দল মিলে নন্দাজীর সঙ্গে গভর্নর-হাউসে দেখা করে যে দাবি করেছিলাম, সেই দাবি এখনও আমরা করছি। কাল পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ টোটাল মাইগ্রেশন দাবি করেছে, সমস্ত লোক যাতে চলে আসতে পারে সেই দাবি করেছে। কিন্তু বলা হচ্ছে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। স্যার, আপনি কি চিন্তা করতে পারেন, সেখানে যে মাইনরিটি রয়েছে তাদের পাকিস্তানের নিষ্ঠুর শাসকবর্গের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকতে পারি? স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা একসাথে লড়েছি, তাদের কথা কি আজ আমরা ভাবব না? আজ তাঁরা কী করে এই কথা বললেন এবং কী করে মাইগ্রেশনের পথে নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করছেন তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আজ সেদিক থেকে নন্দাজীর উচিত আমরা যেমন চীনের আক্রমণের ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম, বেরুবাড়ি সম্পর্কে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম, পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সেই রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আসা। তা আমাদের সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমি তাদের সকলের কাছে আপনার মাধ্যমে এই আবেদন জানাচ্ছি। কারণ সেখানে তাঁদের কোনও রকম নিরাপত্তা নেই এবং পাকিস্তানি সরকারও স্বভাবতই তাদের আগমনের পথে নানাভাবে চেষ্টা করবে বাধা সৃষ্টি করতে। কিন্তু আমাদের ভারত গভর্নমেন্টের এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, বিশেষ করে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে চেষ্টা করতে হবে যাতে করে সকলকেই মাইগ্রেশন দেওয়া হয়। আজ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের এবং তাদের রক্ষা করার খানিকটা দায়িত্ব আমাদেরও রয়েছে। সেই দায়িত্ব আমরা অবহেলা করতে পারি না। দরকার হলে সব দিক থেকে আজ পাকিস্তানি গভর্নমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির মাধামে। আজ পাকিস্তানে যে সমস্ত আন্দোলন হচ্ছে আমরা মনে করি বাস্তবিকই সেগুলি প্রগতিশীল আন্দোলন। সেখানে ছাত্ররা আন্দোলন করছে, এবং আমরা শুনেছি এবং জানি, সেখানকার প্রগতিশীল মুসলমানরাও তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে।

কিন্তু আয়ুবশাহি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সেই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য একটা বিশেষ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কারণ, আয়ুবশাহি আজ বুঝতে পারছে যে, হিন্দু-মুসলমানের এই প্রগতিশীল আন্দোলনকে বন্ধ না করতে পারলে তাদের সেখানে রাজত্ব করা অসম্ভব হবে। একদিন এই দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল, তখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই একই স্বরূপ দেখেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিল, এইভাবে স্বাধীনতার লড়াই করে আমরা তাদের কী করতে পারব? কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও অবসান ঘটল। কাজেই আয়ুবশাহির

এইভাবেই পতন হবে। সমস্ত হিন্দুদের আমরা যদি এখানে নিয়ে আসি তা হলে সেখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি থাকবে না এবং জনসাধারণের এই প্রগতিশীল আন্দোলনকে দমন করার সুযোগ থাকবে না। আমরা যদি সেই সমস্ত সংখ্যালঘুদের এখানে নিয়ে আসতে পারি এবং এই প্রগতিশীল আন্দোলনের চাপে এই আয়ুবশাহির পতন হলে পর সেখানে যে প্রগতিশীল সরকার গঠিত হবে তাতে পশ্চিম বাংলার ও ভারত সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধা হবে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে আমি বলি, টোটাল মাইগ্রেশন দরকার। মাইগ্রেশন সম্বন্ধে কোনও বাধানিষেধ রাখা উচিত নয়। সমস্ত হিন্দুকেই আসতে দিতে হবে। সেখানে যারা সংখ্যালঘু আছে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই সমান। সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে এবং আমাদের এই সরকারেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি নিজে দেখেছি কলেজ স্ট্রিটে পুলিশের প্রহরা আছে কিন্তু লুঠ হচ্ছে, পুলিশ তাদের কিছু বলছে না। কাজেই সেদিক থেকে সকল বক্তাই বলেছেন যে আমাদের এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়। পাকিস্তানে যেমন অনেক বাঙালি মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য জীবন দিয়েছে, বিপদগ্রস্ত হয়েছে , ঠিক তেমনই এখানেও রায়টের সময় কিছু কিছু হিন্দু বিপন্ন হয়েছে। কাজেই এখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঘরবাড়ির ব্যবস্থা যেমন করা উচিত ঠিক তেমনই হিন্দু যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্যও ব্যবস্থা করা উচিত। স্যার, আমি পূর্বেই বলেছি পাকিস্তানের ব্যাপারে আমরা একটা তোষণ নীতি অবলম্বন করছি। তারা যা করছে আমরা তাই মেনে নিচ্ছি। আমাদের বর্ডারে যারা আসছে তাদের ইনরুড করছে, লুটপাট করছে, ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, গরু-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে— অর্থাৎ একটা যেন মগের মুল্লুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ভারত গভর্নমেন্টের তোষণ নীতির ফলে আমাদের অনেক জমি দখল করেছে এবং আমি বলতে পারি, আমাদের এই তোষণ নীতির ফলেই পাকিস্তানের এতখানি সাহস বেড়েছে। যে কোনও অন্যায় অত্যাচার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে করতে পারছে। কাজেই আমাদের একটু কড়া হওয়া দরকার এবং আর্মির সাহায্য নিয়ে আমাদের বর্ডারগুলিকে প্রোটেকশন দেওয়া দরকার। স্যার, আমাদের বর্ডারে যে সমস্ত নাগরিকরা রয়েছে তাদের ওপর অত্যাচার করছে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে অথচ এগুলি রক্ষা করা হচ্ছে না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে , এই ব্যাপারে যত টাকার দরকার, দেশরক্ষার জন্য যত টাকার দরকার, তার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্ডারের ওপর এরকম অত্যাচার করবে, লোকেদের ঘরবাড়ি জ্বালাবে, লোক মারবে—এসব কেন হবে? এটা কি একটা স্বাধীন দেশ নয়? এটা কি মগের মুল্লুক? এই সব লোককে রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারকে বার

বার বলেছি কিন্তু সেই ব্যবস্থা হয়নি। আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি, বর্ডারের জনসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর স্যার, আমরা দেখছি সাম্প্রদায়িকতা আমাদের মধ্যে এখনও রয়েছে। যেমন গতকাল সামসুদ্দিন ভাই বললেন,আমি মুসলমান। আমি মনে করি রাজনীতিতে আমরা সকলেই এক জাতির নাগরিক। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। আমরা সেটা মানি না। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সকলের সমান অধিকার। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু কিছু কিছু মুসলমান আছেন তাঁরা মনে করেন আমরা প্রথমে মুসলমান, তারপর এই রাষ্ট্রের নাগরিক। তাঁদের এই যে মনোভাব—অর্থাৎ এখানকার নাগরিক এবং মুসলমানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ চলছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, একজন মুসলমানের যেমন নিজের ধর্ম, নিজের সংস্কৃতি পালন করার অবাধ অধিকার থাকবে, ঠিক তেমনই একজন হিন্দুরও নিজের ধর্ম এবং সংস্কৃতি পালন করার অবাধ অধিকার থাকবে। যা হোক, এই সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু না বলে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকের স্থান যেন ভারতবর্ষে না হয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের মনোভাব হবে প্রথমে সে ভারতবর্ষের নাগরিক, তারপর সে হিন্দু বা মুসলমান। একথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে অমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪।

মাইগ্রেশন শিথিল হোক

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, পূর্ববঙ্গে যে দাঙ্গা হয়েছে এইরকম দাঙ্গা ইতিহাসে খুব কমই শোনা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন, হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে, ঘরবাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সর্বস্বান্ত হয়েছে। কাজেই আর পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের থাকা নিরাপদ নয়। এটা আমরা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তাদের সেখানে কোনও নাগরিক অধিকার নেই। তাদের কোনও সিটিজেনশিপ রাইট নেই। তাদের জন্যে মানুষের মতো ব্যবস্থা করেছে বলে আমি জানি না। তারা অপমানমূলক অবস্থায় বাস করছে, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় তাদের বাস করতে হচ্ছে, কোনও কিছু বলার বা করার অধিকার নেই। কাজেই এই দাঙ্গা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে এখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের কর্ণধাররা যা বলে দিয়েছেন সেটা কার্যে পরিণত করতে পারেননি। নেহরু-লিয়াকত প্যাক্টে যে শর্ত আছে তাকে কার্যকর করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ দেবার জন্য এই সরকারকে অত্যন্ত দুর্বল দেখা যাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের থাকার কোনও রাস্তা নেই। বারবার শ্রীনন্দার কাছে বলা হয়েছে মাইগ্রেশন শিথিল করা হোক, যারা আসতে চায় তাদের আসতে দেওয়া হোক। তিনি আমাদের কথাও দিয়েছিলেন যে অনেকখানি শিথিল করা হবে। আজকে সংবাদপত্রে দেখলাম, সরকারের আগেকার দুর্বল নীতি এবং পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে নীতি সেই নীতিই আজ নন্দার স্টেটমেন্টের মধ্য দিয়ে অত্যধিক পরিষ্কার হচ্ছে। কাজেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কোনও মতেই সেটা মেনে নেব না। আমরা চাই যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা যাতে সকলে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। যদি সেই ব্যবস্থা না করে তাহলে শুধু পশ্চিমবাংলায় কেন, ভারতবর্ষে এক বিরাট আন্দোলন হবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের এখানে নিয়ে আসা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সঙ্কল্পবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকারকে আজ দায়িত্ব নিতে হবে, বাংলা সরকারকে তাদের ওপর আজ চাপ দিতে হবে। বাংলা সরকার আজ কেন্দ্রীয় সরকার যা বলবে সেই অনুসারে কাজ করবে, তাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবে তা নয়। বাংলা সরকারকে আজকে বলতে হবে যে পশ্চিমবাংলার জনমত হল, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের এখানে নিয়ে আসতে হবে, তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর স্যার, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আমাদের বর্ডারগুলি পর্যন্ত আমরা রক্ষা করতে পারি না। আজ আমাদের বর্ডারে পাকিস্তানি গুন্ডারা বারবার হামলা করছে এবং তারা আমাদের জমি দখল করে নিচ্ছে

এবং নানাভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। আমরা বারবার এই অ্যাসেম্বলিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এই বিষয়ের প্রতি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় পাকিস্তানি ন্যাশনাল, যাদের কোনও রকম পাসপোর্ট নেই বা কোনও ভ্যালিড ডকুমেন্ট নেই, তারা এখানে বিভিন্ন জায়গায় আস্তানা গেড়ে উস্কানি দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় রায়ট হত না। পাকিস্তানি মুসলমান যারা এখানে আছে উইদাউট এনি ভ্যালিড ডকুমেন্ট, তারা যদি এই উস্কানি না দিত তাহলে পশ্চিম বাংলায় রায়ট হত না এবং খালি যে এই রায়টে মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়, অনেক হিন্দুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে কথাও আমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই চাই যে পশ্চিমবঙ্গে যারা থাকবে তারা এদেশকে ভালবাসবে। তাদের সকলেরই, তারা যে-কোনও সম্প্রদায়েরই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রিস্টান হোক, প্রত্যেকেরই নিরাপত্তা বিধান করা হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু এই নিরাপত্তা কীভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল তা এনকোয়ারি করলেই পরিষ্কারভাবে জানা যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষ করে সাবধান করে দিচ্ছি যে আমাদের স্বাধীনতা একদিকে সীমান্তে চীনের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং তারা আমাদের জমি দখল করে বসে আছে, আজ পর্যন্ত তার কোনও সমাধান হয়নি, অপরদিকে আমাদের এই গভর্নমেন্ট এতই দুর্বল যে পাকিস্তানি সীমান্তে অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে এটা আজ সকলেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও সরকার থেকে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না। যদি সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে জনসাধারণ বাধ্য হবে এই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই সরকারের অবসান ঘটানোর জন্য এবং জনসাধারণ তার জন্য সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য হবে। সেদিক থেকে আমি সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি।

অবনী কুমার বসু : আপনি সাজেশন দিন।

সাজেশন হচ্ছে, বর্ডার রক্ষা করুন। পাকিস্তানি ন্যাশনাল উইদাউট এনি ভ্যালিড ডকুমেন্ট এখানে আছে। আমাদের পুলিশ কোথায় গেল? তারা এখানে এসে কীভাবে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ করতে পারে? আমাদের সি আই ডি পুলিশ—আমাদের যে সমস্ত যুবকেরা স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যে লিপ্ত থাকত, তাদের টুঁটি ধরে নিয়ে আসত— সেই পুলিশ আজ কোথায়? আজ আমাদের দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন। কোথায় তারা? আমরা যদি এইভাবে চলি, বহু লোকের রক্তদান ও নির্যাতনের ফলে আমরা আজকে যে স্বাধীনতা পেয়েছি আমাদের সেই স্বাধীনতা থাকবে না। একদিকে চীনের আক্রমণ আর একদিকে ভুট্টো সাহেব পরিষ্কার বলে দিয়েছেন তাঁরা এই ব্যাপারে পররাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত আছেন। আমরা যদি কেবল তোষণ নীতি নিয়ে চলি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন

হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপর স্যার, আমাদের দেশে যেসব অ্যান্টি-ন্যাশনাল এলিমেন্ট আছে তাদেরও বিশেষভাবে সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের ভোটের দিকে চেয়ে নয়, দেশের কল্যাণ এবং স্বার্থের দিকে চেয়ে আমাদের সরকারি নীতি পরিচালনা করতে হবে। কাজেই সেদিক থেকে সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে যে পূর্ব বাংলার সকল লোককেই নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বারবার দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে সেখানে তাদের জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। অতএব দেশ বিভাগের সময় আমরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম সেই অনুসারে আমাদের কাজ করতে হবে। যদি সেইভাবে কাজ না করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে একটা বিরাট গণ-আন্দোলনের সন্মুখীন এই সরকারকে হতে হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪।

সরকার সাবধান

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতন এবং হত্যার তান্ডবলীলার মধ্যে এই বাজেট আমাদের সামনে এসেছে, অথচ এই বাজেটে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। শৈলবাবুর ভাষণে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে কোনও কথার উল্লেখ নেই—রাজ্যপালের ভাষণে অবশ্য কিছু উল্লেখ ছিল। যদিও কার্যকর কিছু ছিল না। তারপর শৈলবাবু চীনা আক্রমণের কথা বলেছেন, অথচ দেখা যাচ্ছে চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য বাজেটে কোনও অর্থ ধরা হয় নি। অথচ এটা ভারত গভর্নমেন্টের অধীনস্থ। কাজেই এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য কোনও টাকা ধরা হয়নি। কিন্তু সিভিল ডিফেন্সের জন্যও কিছু টাকা ধরা হয় নি। বাজেটে আমাদের মূল দুটি প্রশ্ন, তা দেখতে পাচ্ছি না। অর্থমন্ত্রী কোনও আশার চিত্র ধরতে পারেননি, না বেকার সমস্যার সমাধান, না জিনিসপত্রের দাম কমানো, না জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো —এর কোনও ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। দেশের মানুষের এই বাজেট থেকে কিছুই হবে না। সাধারণ মানুষের উন্নতির কোনও ব্যবস্থা আমরা করতে পারছি না। কাজেই কেবল ফিগার-এর ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি। শিল্পের উৎপাদন যে বিশেষভাবে বাড়ছে তা দেখতে পাচ্ছি না। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা, তা বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না।১৯৫১-৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে, এই ১০ বছরে শ্রমিকের সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা ৩৪.৫ থেকে কমে ৩৩.২ ভাগ হয়েছে। শিল্প যদি বাড়ে তবে শ্রমিক সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু শ্রমিকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে শিল্পের উৎপাদন সেই অনুসারে বাড়ছে না। আর যে অন্যান্য সমস্যা রয়েছে তাতে সমাধানের কোনও কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কৃষির উৎপাদনও তেমনই কমে যাচ্ছে। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনের সূচক ছিল ১৩১.৮৩, আর ১৯৬১-৬২ সালে হল ১৩০.১০ আর। ১৯৬২-৬৩ সালে সেটা হল ১২১.০৬। কাজেই শিল্প বাড়ছে না। কৃষির উৎপাদন বাড়ছে না। এই দুই বছরে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ কমে গিয়েছে। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রতিকূল অবস্থার কথা বললে আত্মসন্তুষ্টির ভাব বা নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা চাপা দেওয়া যায় না। সরকার যে প্রত্যেক ব্যাপারে অক্ষমতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে এর থেকেই সেটা বেশ ভাল বোঝা যাচ্ছে। সমগ্র ভারতের জাতীয় আয়ের কথা বলা হয়েছে যে, জাতীয় আয় বাড়ছে ৫ ভাগ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইকনমিক রিভিউতে দেখছি বেড়েছে মাত্র আড়াই ভাগ। যদিও তরুণ সেনগুপ্ত মহাশয় দেখিয়েছেন যে ফিগার সম্পূর্ণ ভুল। আমরা

দেখতে পাচ্ছি যে এইরকম ভুল আরও অনেকের মধ্যেই রয়েছে। জাতীয় আয় যা বেড়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয় নি। সেই জাতীয় আয় বেশির ভাগই রাঘব বোয়ালের পকেটে ও মুনাফাখোরদের পকেটে গিয়েছে, সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয় নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম কমাবার কোনও চেষ্টা নেই। এই নিয়ে দেশে যথেষ্ট আন্দোলন হয়েছে, বিশেষ করে চালের ব্যাপারে। কিন্তু সরকারের কোনও চেষ্টা নেই জিনিষপত্রের দাম কমানোর। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে সূচক ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১২৪.৯, ১৯৬১-৬১ সালে ছিল ১২৫.১ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে হয়েছে ১২৭.৯। কাজেই জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাজেটে এমন কিছু নেই, কোনও ব্যবস্থা নেই যে জিনিসপত্রের দাম কীভাবে কমানো যাবে। সাধারণ মানুষের জীবিকার্জনের কতখানি সহায়ক হতে পারে বাজেটে তার কোনও ব্যবস্থা নেই। কলকাতার জীবনযাত্রার যে সূচক অক্টোবরের ১৯৬২ সালে ছিল ১২৬.২, পরবর্তী বছরে এই সময় তা বেড়ে হয়েছে ১৩৩ পয়েন্ট। কাজেই চতুর্দিক থেকে আমরা দেখি যে জীবনযাত্রার যে খরচ তার মান দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। ভূমি রাজস্ব বিভাগের আয় বাড়ছে না, তাও কমছে। আমরা দেখছি যে গত বছরের তুলনায় এই বছরে ভূমি রাজস্ব ৮ কোটি ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার থেকে ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ভূমি রাজস্ব বাড়ছে না, সে প্রায় একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেন্দ্র থেকে আমাদের যে টাকা পাওয়া উচিত সেই ন্যায্য পাওনা, এই অ্যাসেম্বলিতে অনেক প্রস্তাব, ইউন্যানিমাস রেজলিউশন করেছি, সেই প্রস্তাব সেখানে পাঠানোও হয়েছে। অথচ আমাদের মন্ত্রিমন্ডলী এতই অপদার্থ যে যেটা আমাদের পাওনা সেই পাওনার জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না কেন্দ্রের ওপর বা তাদের বোঝাতে পারছে না যে আমাদের যে ন্যায্য পাওনা সেটা আমাদের পাওয়া উচিত। আয়কর ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১৪ কোটি ২০ লক্ষ ৯০ হাজার, এবার তা হয়েছে ১৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৩ হাজার। কাজেই এইভাবে আমাদের যা যা পাওয়া দরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তা আমরা পাচ্ছি না। তারপরে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে একটা সঙ্কটের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আজ সন্তোষপুর থেকে কতগুলি লোক আমার কাছে এসেছিল এবং তারা বলে গেল পুলিশের ভয়ে তারা মাঠে লাঙ্গল নিয়ে যেতে পারে নি। তারা একটা নোট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও পুলিশের অত্যাচারের খবর আসছে। কাজেই আমরা দেখছি সেদিকেও কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই আমি বলছি সরকার যদি এদিকে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে পারে তাহলে দেশে একটা ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি হবে এবং সরকারকে একটা বিরাট আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হবে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪।

পাট চাষীদের ঠকানো হচ্ছে

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় মাত্র ৬০ লক্ষ টাকার যে ট্যাক্সেশন র-জুটের ওপর ধরছেন, এই রকম একটা প্রস্তাব না আনলেই ভাল ছিল। আমরা বামপন্থীরা বরাবর যে কথা বলেছি সে কথা ভারত গভর্নমেন্টকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, বড় লোকেরা বরাবরই সেলস ট্যাক্স, ইমকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। আমাদের এই কথার পরে জহরলাল নেহরু অ্যাড্ভুল সাহেব বলে এক বড় অর্থনীতিবিদকে নিয়ে এলেন। তিনি এনকোয়ারি করে বললেন আমাদের দেশের বড় লোকেরা ৩০০ কোটি টাকা বছরে ফাঁকি দেয়। আমরা বরাবর বলছি, যারা ফাঁকি দিচ্ছে তাদের টাকা ধরুন। বাজারে যে কালো টাকা রয়েছে সেই টাকা ধরুন। কিন্তু আমাদের কথার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরে তারা যখন দেখল যে ইমার্জেন্সির সময় টাকার অভাব হচ্ছে তখন কালো টাকা ধরার কিছু চেষ্টা করল, কিন্তু তাও ভাল করে আইন করে ধরল না। কৃষ্ণমাচারি যিনি কালো টাকা ধরতে গিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিশেষ দুর্নীতির ব্যাপার বেরিয়ে পড়ল। সেটা কাগজে আমরা দেখেছি। কাজেই তারা কালো টাকা ধরবে না এটা পরিষ্কার এবং যেটুকু না হলে নয় সেইটুকু তারা করবে। সেদিক থেকে আমরা বরাবর বলেছি বড় লোকেরা ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। বাজারে প্রচুর কালো টাকা রয়েছে, সেগুলিকে ধরলে এই সামান্য ৬০ লক্ষ টাকার জন্য আবার ট্যাক্সের প্রস্তাব আনতে হত না। এই প্রস্তাবের ফলে চাষীদের ওপর যে চাপ দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সারা ভারতবর্ষে ১১০টি মিল আছে যার মধ্যে বাংলা দেশেই ৮৭টি মিল আছে। চাষীরা যখন পাট নিয়ে যায় সেই পাট যেভাবে মিলের লোকেরা ওজন করে তাতে ৪ মণ পাট নিয়ে গেলে সেটাকে ৩ মণ, সাড়ে ৩ মণে দাঁড় করিয়ে তাদের দাম দেয়। এখন এক বিঘা জমিতে ৪ মণ পাট হয়, তার জন্য খরচ পড়ে ১০০ থেকে ১২৫ টাকা। অথচ এই পাট তারা মিলে বিক্রি করে ১০০ টাকা পায়। এইভাবে চাষীরা যে বঞ্চিত হয় এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। আমাদের দেশে যে পাট আছে তার কোয়ালিটি চার রকমের। এক রকম হচ্ছে টপ, আর এক রকম হচ্ছে মিডল, আর এক রকম হচ্ছে বটম এবং আর এক রকম হচ্ছে বি-বটম। মিলের কর্তারা যে পাটের হেসিয়ান বা গানি ব্যাগ তৈরি করে সেটা বেশির ভাগ বি-বটম থেকে তৈরি করে। সেটা তারা বটম বা মিডল বলে বাজারে বিক্রি করে। এইভাবে কোটি কোটি টাকা এই রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা যে পাটের গানি বা হেসিয়ান তৈরি করে সেই পাটের অনেক ধুলো পাওয়া যায়। ধুলো আছে বলে তারা পাটের পরিমাণ কম

দেখিয়ে চাষীকে ঠকিয়ে ৪ মণের জায়গায় ৩ মণ ওজন করে কেনে এবং কিনে বি-বটমকে মিডল এবং মিডলকে টপ বলে বাজারে বিক্রি করে। অপর দিকে তারা পাটে বহু ধুলো আছে এই অভিযোগ দেখিয়ে অনেক জিনিস যা ড্যামেজ্‌ড নয় সেই জিনিসকে ড্যামেজ্‌ড বলে কম দামে বিক্রি করে সেলস্‌ ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। সেদিকে আমাদের অর্থমন্ত্রীর নজর সেই। তিনি যদি এই ৮৭টি মিল অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন তারা চাষীদের কাছে কীভাবে কী ওজন নিয়ে কেনে এবং তারপর সেই পাট কী দরে বিক্রি করে এবং সেই পাটের জিনিস কীভাবে ড্যামেজড বলে বাজারে বিক্রি করে। এইগুলি তিনি যদি অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে শুধু এই ৬০ লক্ষ টাকা কেন, কয়েক কোটি টাকা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং এই ট্যাক্স বাড়াবার কোনও দরকার হবে না। কিন্তু সেদিকে সরকারের নজর নেই। মিল মালিকেরা কম দরে চাষীদের কাছ থেকে পাট নেয় এবং ওজনও কম দেয়, আবার এই ট্যাক্স চাপানোর ফলে তারা যে আর কম দরে পাট নেবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চাষীদের মিল মালিকদের কাছে বিক্রি করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কারণ মিল মালিকদের কাছ থেকে তাদের দাদন নিতে হয়। এইভাবে চাষীরা ঠকছে। সেইজন্য আমি বলছি যে এই ট্যাক্সেশনের জন্য একটা ছোট বিল এনে বাংলাদেশের চাষীর ওপর যে একটা গুরুভার চাপানো হচ্ছে সেটাই বড় জিনিস, ৬০ লক্ষ টাকা ট্যাক্সটাই বড় জিনিস নয়। কাজেই সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি।

নভেম্বর, ১৯৬৫।

কমনওয়েলথ ত্যাগ কর

চেয়ারম্যান মহাশয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা সবাই অভিজ্ঞ। ভারতবর্ষকে যখন তারা শাসন করেছে তখনও তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই নীতিতে শাসন করেছে। ভারতবর্ষ যখন তারা ভাগ করে যায় তখনও তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই নীতিতেই ভাগ করে যায়। ভারতবর্ষ যাতে ঐক্যবদ্ধ না থাকতে পারে এবং ভারতবর্ষ যাতে শক্তিশালী না হতে পারে সেই কারণেই তারা ভারতবর্ষকে ভাগ করে গেছে। ভারতবর্ষ যেহেতু এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল—পাকিস্তানও ছিল—সেই হেতু তারা বরাবর মনে করেছে যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারে থাকবে। তারা যা বলবে যা নির্দেশ দেবে সেই অনুসারে ভারতবর্ষ কাজ করে যাবে। যখন পাকিস্তানকে আক্রমণ করা হল তখন আমাদের বাহাদুর সৈন্যরা গিয়ে খুব সাফল্যের সঙ্গে পাকিস্তানের সৈন্যদের পরাজিত করেছিল এবং তাদের ফিরিয়েও দিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত এই ভারতবর্ষের মাথার ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর যিনি শাসক তিনি বসে আছেন, যদিও তিনি গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় নন—কিন্তু তবুও তাঁর নির্দেশে ঠিক হল যে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করা হবে না, এই সমস্যার সমাধান হবে পরে। তারপরে একটা সিজ ফায়ার লাইন স্থিরীকৃত হল। কাজেই এইভাবে বিভক্ত ভারতবর্ষকে আবার একটা ভাগ করার পরিকল্পনা, কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে, ব্রিটিশ নীতি অনুযায়ী হল। সুতরাং কাশ্মীরের সিজ ফায়ার লাইনের জন্য আজ যে অবস্থা হয়েছে তাতে পাকিস্তান কাশ্মীরকে চায়। কিন্তু কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা যখন কাশ্মীরকে আক্রমণ করল তখন এটা খুবই পরিষ্কার যে তারা নিশ্চয়ই আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই সেটা করেছিল যে, তোমরা কাশ্মীর যদি অধিকার করতে পার, ভারতবর্ষকে মার দিতে পার, তাহলে আমাদের সমস্ত সাহায্য তোমরা পাবে। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর ভারতবর্ষ যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল, ভারতবর্ষের সামরিক প্রস্তুতি অস্ত্রশস্ত্রের যে অভাব ছিল তা ১৯৬২ সালের পর সমস্ত কিছু পূরণ করে ভারতবর্ষ যতখানি সম্ভব তার সংগঠিত ক্ষমতার দ্বারা পাকিস্তানকে রোধ করেছিল। আমেরিকা মনে করেছিল যে প্যাটন ট্যাঙ্ক এবং স্যাবার জেটের সাহায্যে এবং ইংরেজ ভেবেছিল তার অফুরন্ত সাহায্যে নিশ্চয়ই পাকিস্তান ভারতবর্ষকে ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। এই রকম যে অবস্থা হবে এটা তারা কেউ ভাবতে পারে নি। পাকিস্তানের পেছনে যে ইংরেজের সমর্থন ছিল তা আজ

অত্যধিক পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইউনাইটেড নেশনস-এর মধ্যেও আমাদের যে দাবি যে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীর এবং পাকিস্তান অ্যাগ্রেসার এটা স্বীকার করা হোক, কিছুতেই তাদের ষড়যন্ত্রে সেটা স্বীকার করা হল না। তারা যখন দেখল যে ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে বেশ করে মার দিচ্ছে তখন তারা আর কোনও রাস্তা না দেখে—প্যাটন ট্যাঙ্ক স্যাবার জেট যখন বিফল হল তখন তারা সিজ ফায়ারের পরামর্শ দিল।

বহু অত্যাচার এবং বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়ে, গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর্য এবং ত্যাগের ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে। আপনি জানেন যে, ১৯৪২ সালে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলন যদিও ভারতবর্ষের গণ-অভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তবুও আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মচারীদের বিচারের ফলে সারা ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভয় পেয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন পাঠিয়েছিল। সেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষের কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়েছিল, ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে থাকবে এই শর্তে। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রেখে যতটা সম্ভব শোষণ এবং নেতৃত্ব কায়েম রাখার জন্যই এটা করা হয়েছিল বলে আজ আমাদের মনে হচ্ছে। আজ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নেশনস-এর কর্তা কে? তা হচ্ছে রানি। সেখানে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কুর্নিশ করতে হয়। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দিক থেকে এর মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কাজেই আজ যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে আমরা বরাবর বলে আসছি, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের থাকার কোনও মানেই হয় না। ইউনাটেড নেশনস-এর মধ্যে থাকার বরং মানে হয়। কিন্তু ইউ এন ও-র মধ্যে থেকে যদি সার্বভৌমত্ব, আমাদের মর্যাদা এবং নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় তা হলে সেখানেও আমরা থাকব না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে কখনই আমরা থাকব না। আজকে ব্রিটিশের যে চাতুরী সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ আমেরিকা খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে, পি-এল ৪৮০-র ব্যাপার নিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই এই অ্যাসেম্বলিতে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকব কিনা। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পুরাপুরি মত, যে কথা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করো এবং তা করে ভারতবর্ষের কাজে লাগাও—আজ সেই কথা স্মরণ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ কর! ত্যাগ কর! ত্যাগ কর!

১২ নভেম্বর, ১৯৬৫।

এই খাদ্যনীতি কাদের স্বার্থে ?

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৬ সালের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছে এবং আজকেও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে ভাষণ দিলেন, সে বিষয়ে বিবেচনা করে সারা বাংলাদেশের জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রী তথা খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে এই খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যে আশা করেছিল, তাদের মধ্যে যে উৎসাহ জেগেছিল, সেই সমস্ত উৎসাহ এবং আশা নির্মূল হয়ে গেল। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা খুবই জটিল হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য যে সমস্ত পথ তিনি আমদের সামনে রেখেছেন, সেগুলির দ্বারা সেই সঙ্কটের সমাধান হওয়া খুবই কঠিন। বরং সমস্যা আরও দিন দিন জটিল হয়ে পড়বে।

ধানের দর তাঁরা বেঁধে দিচ্ছেন। বাস্তবিকই যাঁরা গ্রামের খবর রাখেন, অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রাখেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণভাবে যে খবর আমরা পাই যে দেড় একর সেচ এলাকার জমি আর দুই একর সেচ এলাকার বাইরের জমি লেভি থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, কারও ওপর লেভি চাপানো হবে না। তার ওপরের যে জমি তাতে লেভি ধরা হবে। এখন তিন একরই করুন, আর আড়াই একর করুন, চার একর করুন, আর পাঁচ একর করুন, আমাদের বাংলাদেশে যে ধান বিঘা প্রতি উৎপাদন হয়, তাতে চার মণ বা পাঁচ মণের বেশি হয় না অ্যাভারেজে। তাহলে এক একরে ২৫ মণ বা তিন একরে ৪৫ মণ হবে এবং তাতে চাল হবে ৩০ মণ, তার বেশি হবে না। একটা পরিবারে যদি ৫/৬ জন লোক থাকে এবং চাষী পরিবারের যে যা খাবে তার খাই-খরচ অন্তত মাথা পিছু তিন পোয়া করে গড়ে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই সেদিক থেকে এই ৩০ মণ চাল ৫ জনের পরিবার হলেও ৬ জনে হয় না, অন্তত ৯ মণের কমে কোনও মতে হতে পারে না। কারণ কৃষক যদি ভাল করে খেতে না পায় তাহলে সে পরিশ্রম করবে কী করে? বাংলাদেশের অন্যান্য লোকেরা কিছু কম খেতে পারে, কিন্তু কৃষকরা কম খেয়ে ফসল উৎপাদন করতে পারবে না। তারপর লেভি সিসটেমে যেভাবে ধান নেওয়া হবে ১৪ টাকা করে, তাতে কৃষকের যা খরচা পড়ে তাতে ১৪ টাকা করে ধানের দর হতে পারে না। এক বিঘা জমিতে কৃষকের যা খরচ পড়ে তা অন্তত ৯২ টাকা থেকে ৯৬ টাকা। বীজ, সার, লাঙল, বলদ, এই সমস্ত দাম ধরে। কাজেই এক বিঘা জমিতে যদি ৪ মণ ধান হয় তাহলে তার খরচ পড়ছে মণ প্রতি ২৪ টাকা। যদি আরও কম করে ধরা যায় তাহলে অন্তত ২০ টাকা মণ প্রতি হয়ই। প্রত্যেক জিনিসের দাম বেশি। সেই অনুসারে যদি ধরা যায় তাহলে ২০ টাকার কম হয় না। কাজেই কৃষকের কাছ থেকে যদি কম দরে ধান

নেন তাহলে কৃষক দেবে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে যারা অল্প জমির মালিক, যেমন ১ একর, ২ একর জমির মালিক, তাদের ক্ষেত্রে বলেছেন যে এরা লেভির আওতা থেকে বাদ যাবে। আমি বলছি যে অন্তত ৫ একর জমির মালিক পর্যন্ত যেন বাদ যায়। সেচের জমি ৫ একর এবং সেচ- বিহীন জমি ৭ একর, এদের ওপর লেভি না করে তার ওপরে লেভি করা হোক। কিন্তু সরকার গরিব চাষীর ওপর লেভি চাপাচ্ছে এবং গরিব চাষী এবং জনসাধারণ সে ধান উৎপাদন করলেও সেই ধান তারা ধরে রাখতে পারে না। কারণ তার নানা রকমের খরচ আছে, মহাজন আছে, তার ঋণ আছে, কাজেই তাকে ধান বিক্রি করে দিতে হয়। এঁরা বলছেন যে আঞ্চলিক কর্ডন করে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখবে এবং সেই ভয় তাদের দেখিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই ধান আদায় করবেন। বড় বড় যারা জোতদার, যাদের পরিবারে ১০/১৫০/২০০ বিঘা জমি আছে তাদের জমি এমন ভাবে ব্যবস্থা করা আছে যে তাদের ওপর লেভির চাপ পড়বে না যতখানি পড়বে এই গরিব চাষীদের উপর। সেজন্য লেভির যেভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে সেটা সম্পূর্ণরূপে বিফল হবে। কৃষক যারা তারা কম দরে ধান দেবে না। কৃষকদের যদি পয়সা বেশি দেওয়া যায়, তারা যদি ন্যায্য মূল্য পায় তাহলে তারা হয়ত ধান দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী এগ্রিকালচারাল প্রাইস কমিশনের যে কথা বললেন সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এগ্রিকালচারাল প্রাইস কমিশন বিচার বিবেচনা করে কয়েক বছর আগে একটা দর ধরেছে। কিন্তু আজকে দাম অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে, সে হিসাব তারা বিচার বিবেচনা করার সুযোগ পায় নি। তারপর সরকার বলেছে যে কর্ডন করে পুলিশ দিয়ে ঘিরে তারা এই ধান আদায় করবে। তার মধ্যেও লুপ-হোল আছে। আমরা যে স্টেট ট্রেডিং-এর কথা বলেছি সেই স্টেট ট্রেডিং এর মধ্যে নেই। যে সমস্ত চাল ব্যবসায়ী জনসাধারণের দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে, খাদ্যের অভাবের সুযোগ নিয়ে চোরাকারবার করেছে তাদেরই ওপর এই চাল কেনার ভার দেওয়া হবে ডি পি এজেন্ট হিসাবে। মিল মালিক, যাদের গত বছর ৪ লক্ষ টন চাল সরকারের কাছে দেবার কথা ছিল তারা ৪ লক্ষ টন না দিয়ে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টন মাত্র দিয়েছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যবসায়ী যারা নানারকম অন্যায় করে, লোকের রক্ত শোষণ করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করেছে তাদেরই ওপর চাল কেনার ভার আবার দেওয়া হবে। তারপর বলছে কো-অপারেটিভের মারফত ধান-চাল কেনা হবে। আমি তাতে আপত্তি করি না, আমি সমর্থন করি। কিন্তু কো-অপারেটিভের মধ্যে এই বড় বড় জোতদার, বড় বড় চাষীদের প্রভাব আছে, কন্ট্রোল আছে। তবুও কো-অপারেটিভের মারফত ধান চাল কিনুন, এটা সমর্থন করি। আজকাল শোনা যাচ্ছে কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ।কয়েকজন মিলে কো-অপারেটিভের টাকা তছরূপ করেছে এই রকম অভিযোগ পাওয়া যায়, সেজন্য কো-অপারেটিভগুলি যাতে ঠিক মতো চলে, তার মধ্যে যাতে সুবিধাবাদী, স্বার্থবাদী লোকেরা প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আর মিল মালিকদের ধান চাল কেনার কোনও অধিকার দেওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে যত চালের মিল আছে এই মিলগুলিকে জাতীয়করণ করতে হবে। কারণ আমরা মিল মালিকদের চেহারা দেখেছি, তারা

কীভাবে চালের অত্যধিক দাম বাড়িয়ে মুনাফা করেছে সেটা দেখেছি। কিন্তু সরকার তাদের শায়েস্তা করার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করে নি। কাজেই মিল মালিকদের ডি পি এজেন্ট করা উচিত নয়। সরকার নিজের দায়িত্বে এই চাল কিনুক। সেই ধানের দর কী দেওয়া হবে সে সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে যাতে কৃষকরা উৎসাহ, প্রেরণা পায়। এই যে রেশনিং চলছে, এই রেশনিং-এর ফলে সারা বাংলাদেশের লোকেরা কোথাও ৩ টাকা, কোথাও ৪ টাকা দামে চাল কিনছে। এর কমে কোথাও কিনছে না। কাজেই এইভাবে যদি কৃষকদের কিছু বেশি দিয়ে অন্তত এক টাকা কেজি দিয়ে আমরা চাল নিই তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ আমরা জানব যে এক টাকা দরে চাল পাওয়া যাবে, ২ টাকা ৩ টাকা দরে নয়। কাজেই ১৮/১৯/২০ টাকা ধানের দর বেঁধে দেওয়া হোক এবং সেই দরে সরকার কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ধান কিনুক। সেই ধান থেকে চাল তৈরি হলে সেই চালের দাম ৩০/৩১/৩২ টাকা হবে। এটা যদি করা যায় তাহলে ১ টাকা দরে চাল পাওয়া যাবে এবং লোকে বুঝতে পারবে যে আমরা চাষীর ঘরে পয়সা দিচ্ছি। চাষী উৎপাদন করছে এবং এই এক টাকা করে চাল যদি সে বরাবর পায় তাহলে সাধারণ লোক তাদের এই ইকনমিক প্রাইস দিতে কোনও আপত্তি করবে না। সরকার বলছে যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। কিন্তু কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। তারা বলছে যে বর্গাদারকে জমির মালিক করতে হবে। কিন্তু আজকে যে ধানের দর ধরা হয়েছে সেটা যদি হয় তাহলে বর্গাদাররা উৎখাত হয়ে যাবে, এবং হতে আরম্ভ করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই যে নীতি বর্গাদারকে রক্ষা না করে, জমির মালিক না করে উৎখাত করে দেয় সেই নীতির কতখানি মূল্য আছে সেটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও সরকারের এই নীতির ফলে বর্গাদাররা উচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং হতে আরম্ভ করেছে। তারপর রাষ্ট্রীয়করণের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে চালের ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ব করতে হবে। কিন্তু আজ সরকার যে নীতি নিয়েছে তাতে আজকে রাষ্ট্রীয়করণের কোনও ব্যাপার আমরা দেখছি না। আমরা দেখছি যে হোলসেলারের ওপর সেই ক্ষমতাই থাকবে—তারা চাল কিনতে পারবে ব্যবসা করতে পারবে এবং এও দেখছি যে পরিস্থিতি বুঝে অফিসারদের ক্ষমতা দেওয়া হবে—তারা যে কোনও লোকের ওপর দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে। এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে রাষ্ট্রায়ত্ব কিছুই করা হল না। যে পুরনো নীতি ছিল—সেই জোতদার মিলের মালিক এবং সেই সমস্ত ব্যবসাদারদের হাতে ব্যবসা রেখে দেওয়া হল। এইজন্য আমি এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি।

২৯ নভেম্বর, ১৯৬৫।

মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন না

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আজ পর্যন্ত খালি গুলি, লাঠিপেটা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য এই সরকার চেষ্টা করছে। কিন্তু গুলি করে মেরে লাঠি দিয়ে হত্যা করে তারা কি এইভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে? ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যত লোক গুলিতে মারা গেছে, লাঠিতে আহত ও মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে দুর্গাপুরে একটা ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। দুর্গাপুরের শ্রমিকদের হত্যা করা হয়েছে। সেই শ্রমিক যারা দুর্গাপুরে কাজ করে তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের বা সেখানকার কর্তৃপক্ষের কোনও দৃষ্টি নেই। কর্তৃপক্ষের কাছে তারা তাদের সঙ্গত দাবি উপস্থিত করে কোনও জবাব পায়নি। মহার্ঘ ভাতা বাড়ানো, ছাঁটাই বন্ধ করা, বরখাস্তের নোটিস তুলে নেওয়া ইত্যাদি দশ রকমের দাবি নিয়ে তাঁরা জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দেখা করতে যায়। কিন্তু জি. এম. এত অ্যারোগ্যান্ট যে শ্রমিকদের তিনি মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেন না। কারণ শ্রমিকদের হাত থেকে এই দাবীপত্র যে গ্রহণ করবেন সেটা তিনি সঙ্গত মনে করেন না। শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে থাকলেন। জেনারেল ম্যানেজার কতক্ষণ সেখানে থাকবেন? তাঁকে স্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় যেতে হবে। তাঁর ভয়, যদি তিনি শ্রমিকদের সামনে যান তাহলে হয়তো তাঁর উপর আক্রমণ হতে পারে। কিন্তু তিনি যদি যেতেন এবং শ্রমিকদের সঙ্গত দাবি যদি গ্রহণ করতেন তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত।

কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার বললেন যে তিনি শ্রমিকদের মধ্যে দিয়ে যাবেন এবং পুলিশকে তাঁকে প্রোটেকশন দিতেই হবে। পুলিশ প্রোটেকশন দিল শ্রমিকদের ওপর লাঠি চালিয়ে। জব্বর সাহেব বলে একজন শ্রমিককে লাঠির আঘাতে নিহত করল। এইভাবে অযথা সেখানে লাঠি চালাবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিলে সেটা মিটে যেত বা পরে দাবি বিবেচনা করার কথা বললেই হত।এইভাবে জব্বরের ওপর যেভাবে লাঠি চালনা করা হয়েছে তার প্রতিবাদে তার পরদিন সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে একটা হরতাল হল। সংবাদপত্রে দেখা গেছে যে এই রকম হরতাল অনেক দিন হয় নি। সেই হরতালকে বন্ধ করার জন্য তারা কয়েকজন ভাড়াটে লোককে কারখানায় আনতে চেয়েছিল। আগে থেকে কয়েকজন কর্মচারী ভোরের অন্ধকারে প্রবেশ করেছিল। এতেও তারা কারখানা চালাতে পারেনি।না পারাতে পুলিশ এসে গেল। পুলিশ এসে সেই শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করল, জীপে করে এসে একজন শ্রমিক আশিস দাশগুপ্তকে গুলি করল। তাকে গুলি করার কোনও কারণই ছিল না। তারা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালন করছিল এবং এইরকম ধর্মঘট দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই শ্রমিকের ওপর অযথা নির্যাতন করার কোনও কারণ নেই। আমি

বলব এই ব্যাপারে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সরকার তা করবে না। সরকার মনে করছে যে এই রকম লাঠি এবং গুলির মধ্য দিয়ে তারা শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করবে। সেদিন মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন প্রফুল্ল সেন মহাশয়। খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর বরাবর শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলছিল এবং অবধি সেই হরতাল চলেছে। যখন সেখানে হরতাল হবে বলে ঘোষিত হয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সেখানে যাবার কী দরকার ছিল? তা নয়, নিজের প্রভুত্ব দেখাতে হবে। নিজেদের পেছনে কত ক্ষমতা আছে, কত পুলিশের বল, কত লাঠি গুলির বল আছে তা দেখাবার জন্য প্রফুল্ল সেন মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন। প্রফুল্ল সেন বলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে যদি কোনও কাজ হয় আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। শান্তিপূর্ণভাবে যারা হরতাল করবে, সভা-শোভাযাত্রা করবে, তাদের সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই, করার নেই। মেদিনীপুরে সেই হরতাল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছিল। তাঁর সেখানে যাবার এবং সেখানে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা কি আবশ্যক ছিল? পুলিশ সেখানে লাঠি চালিয়েছে, তাতে লাঠির আঘাতে ৭ জন লোককে আহত করা হয়েছে। তারা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সংখ্যা বেশি ছিল। প্রফুল্ল সেন মহাশয় সেখানে কোনও সভা করতে পারেন নি, আমরা যতদূর খবর পেয়েছি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে তিনি মাঝে মাঝে বক্তৃতা করেছেন। সেখানে সমস্ত জনতা সেদিন হরতাল করেছিল এবং তারা সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে জানিয়েছিল 'প্রফুল্ল সেন আজ ফিরে যাও' এই বলে। কিন্তু সেই নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনতার ওপর যেরূপ নৃশংসভাবে লাঠি চালনা করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। ঘাটালের কথা, আপনি জানেন স্যার, ঘাটালের এস. ডি. ও. নির্দেশ দেন যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ৯০ পয়সা চাল দেওয়া হবে। এই খবর পেয়ে সেখানকার সাধারণ লোক তারাও দাবি করে যে তাদের ৯০ পয়সা দরে চাল দেওয়া হোক। কিন্তু সেখানকার যিনি ডিলার, দোকানের মালিক, তিনি বললেন আমি দিতে পারব না। তখন পুলিশ আসে। পুলিশের যে কাজ তা তারা করে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে দরে চাল দেওয়া হচ্ছে গ্রামের চাষী গরিব মজুর তারা গিয়ে সেই দরে চাল চাইবে, এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গভর্নমেন্ট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের চাহিদা, মানুষ যা চায় তাদের বাঁচার জন্য তাদের যে দাবি সেই দাবিকে লাঠির জোরে, গুলির জোরে দাবিয়ে রাখতে চায়। আমি বলব এইভাবে তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এই লাঠি এবং গুলির আঘাতে একদিন এই গভর্ণমেন্টই শেষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২৪ আগস্ট, ১৯৬৬।

বাইরের পুলিশ কেন?

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, হাউসে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে গতকাল থেকে, টি গার্ডেনের শ্রমিদের ওপর গুলি চালনার ফলে, সেই বিক্ষোভ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেবার কথা ছিল, যে সমস্ত পয়েন্ট—যেমন তাদের রেশন, পাঞ্জাবি পুলিশকে দিয়ে তাদের ঠেঙানো ইত্যাদি ব্যাপারে বিবৃতি না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তা এড়িয়ে গিয়েছেন। আমরা দেখেছি গত খাদ্য আন্দোলনের সময়, ফেব্রুয়ারি মাসে বিহার, পাঞ্জাব থেকে পুলিশ আনা হয়েছিল বাঙালিকে ঠেঙাবার জন্য। এজন্য বাংলার রাজস্ব থেকে বহু টাকা খরচ হয়েছে। বাঙালি পুলিশ কি ইন-এফিসিয়েন্ট? তাদের কি শাসন ব্যবস্থা চালাবার কোনও ক্ষমতা নেই, তাদের কি এই সমস্ত জিনিসের মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই? তাহলে বাঙালি পুলিশ ডিসমিস করে দিন। পাঞ্জাবি, বিহারি পুলিশ এনে বাঙালি পুলিশকে ইন-এফিসিয়েন্ট করা গভর্নমেন্টের যে কি নীতি সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আজ মুখ্যমন্ত্রী যে জবাব দিয়েছেন তাতে এই সমস্ত পয়েন্টের জবাব দেন নি। সেইজন্য অ্যাসেম্বলি মেম্বারদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত পালিয়ে না বেড়িয়ে অ্যাসেম্বলিকে ফেস করা এবং অ্যাসেম্বলির মেম্বাররা যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া। আজ এই ব্যাপার নিয়ে আমরা হাউস বন্ধ করতে চাই না। হাউস চালাতে চাই। কিন্তু যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে অ্যাসেম্বলি মেম্বারদের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা থামবে না, এই ব্যাপারটা চলবে। যেহেতু আজকে কলেজ টিচার, প্রাইমারি টিচার, মাধ্যমিক টিচারদের বিষয়ে আলোচনা হবে সেজন্য আজ ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে চাই, কিন্তু ব্যাপারটা বন্ধ হবে না, আগামী সোমবারও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতেই হবে। সেদিক থেকে আজ এই ব্যাপারটা আমরা ডেফার করতে চাই, আজ কলেজ টিচারদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হবে সেই বিষয়ে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু এ ব্যাপারটা বন্ধ হবে না, ওর আলোচনা হবেই। স্যার, আমরা দেখছি যে প্রায় ৫ হাজার অশিক্ষক কলেজ স্টাফ এখানে এসেছেন, শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে চান। তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বহুদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন করছেন। আজ যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে তাতে তাঁরা যে সামান্য মাইনে পান তার দ্বারা তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবি বারবার সরকারের কাছে দেশের কাছে উপস্থিত করছেন এবং আজ তাঁরা এডুকেশন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চান। কবে তাঁরা দেখা করবেন সেটা যদি জানান তাহলে ভাল হয়।

২৬ আগস্ট, ১৯৬৬।

আমিও নৈরাশ্য প্রকাশ করছি

স্পিকার মহাশয়, আমার বাজেট সম্পর্কে ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এবং আরও অনেক সদস্য নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। আমি আমার নিজের বাজেট সম্বন্ধেও নৈরাশ্য প্রকাশ করছি। কারণ বাংলাদেশে এই কয়েক মাস আমি ঘুরে রাস্তাঘাট যা দেখলাম তাতে সেই সমস্ত রাস্তাঘাটের নির্মাণ কার্য যদি করতে হয় তাহলে অনেক টাকা লাগবে। গতবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা ৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলাম, এবার পাচ্ছি ২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ২০ কোটি টাকা খরচ হবে ইনকমপ্লিট রাস্তা তৈরির জন্য—অর্থাৎ মাত্র থাকবে ৬ কোটি টাকা। কাজেই এই ৬ কোটি টাকা দিয়ে কী করা যাবে বাংলাদেশে দু'শ মাইল রাস্তা করতে কত খরচ হবে সেটা আপনারা অনুমান করতে পারেন। সেজন্য যদি আপনারা বলেন আমার বাজেট নৈরাশ্যজনক, তাহলে সেটা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি। একজন বললেন জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা আদায় করেছি, কিন্তু তা নয়। আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগে ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৭ হাজার, পুলিশ বিভাগে ১৮ কোটি ২২ লক্ষ ৩৬ হাজার এবং আমার বিভাগে ২৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা আছে।

কাজেই ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা কম আদায় হয়েছে তা নয়। সমস্ত রাস্তা ও সেতুগুলির কাজ গ্রহণ করতে গেলে যে অর্থের দরকার হবে তা আমাদের নেই। আমাদের অর্থের খুব অভাব রয়েছে। সাড়ে চার মাস এই গদিতে বসে আমরা এই বাজেট প্রস্তুত করেছি। আগে যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে তার জন্য আমাদের কতগুলি দায়িত্ব আছে। ওপক্ষের অনেকেই বলেছেন যে, এটা ঠিকাদারি বিভাগ। এই কথা ঠিকই যে, এই বিভাগের যা কিছু কাজ করতে হবে সবই ঠিকাদারদের মারফতে। রাস্তা, গৃহ, ব্রিজ ইত্যাদি যা কিছু কাজ আছে তা সবই ঠিকাদারদের কাজ, কনট্রাক্টারের কাজ। কাজেই এই দপ্তরকে যে ঠিকাদার বিভাগ বলছেন এটা সত্য কথা। তবে ঠিকাদারি কাজের মধ্যে দিয়ে যাতে দুর্নীতি না হয়, ঘুষ না চলে, অন্যায় না চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং কোনও কাজ করতে গেলে ঠিকাদার ছাড়া উপায় নেই। একজন বলেছেন কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে তার মারফত যদি কাজগুলি করা হয় তাহলে ভাল হয়। এই প্রস্তাবটি খুব সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু খুব সহজে এটা হবে বলে মনে হয় না। তবে চেষ্টা করা ভাল। কেননা, যাঁরা কো-অপারেটিভে থেকে মেম্বার হিসাবে কাজ করবেন এবং যা লাভ হবে তার কিছু অংশ এঁরা পাবেন এবং এটা ব্যাপকভাবে ভাগ হবে, একজনের পকেটে যথেষ্ট টাকা যাবে না। এতে পাঁচজনের উপকার হবে। কাজেই এই প্রস্তাবটা খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু প্রস্তাব কার্যকর করার পক্ষে

অনেক অন্তরায় আছে এবং সুদূর সাপেক্ষ। বঙ্কিম শাসমল মহাশয় কিছু রাস্তাঘাটের কথা বলেছেন। আমি তো আগেই বলেছি যে সমস্ত রাস্তাঘাট করতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার, কিন্তু আমাদের সেই অর্থের অভাব আছে। টাকা যদি আমরা পাই তাহলে রাস্তা করা সম্ভব হবে, নিশ্চয়ই সেই রাস্তা করতে পারি। সুন্দরবন সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন। সেখানে অনেক রাস্তাঘাট করা উচিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি সুন্দরবন ঘুরে দেখেছি সেখানে রাস্তাঘাটের অভাব আছে। কাজেই যেসব জায়গায় রাস্তাঘাটের অভাব আছে সেখানে নিশ্চয়ই রাস্তাঘাট করতে হবে। কিন্তু সবই হচ্ছে টাকার ব্যাপার। টাকা না পেলে কোনও কিছু করা যাবে না। সুন্দরবনের দুটো রাস্তার প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে। রাস্তার প্রস্তাবগুলির জন্য আমরা জেলা অনুসারে টাকা ভাগ করব। আমরা ১২ কোটি টাকার পরিকল্পনা করব এবং সেই টাকা জেলা হিসাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। কোন জেলায় কোন রাস্তা দরকার, সেই জেলার টাকা অনুসারে যতটা সম্ভব হবে ততটা রাস্তা করা হবে। সমস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আকৃতি অনুসারে সেই টাকা ভাগ করা হবে এবং সেই টাকা ভাগের ওপরই রাস্তাগুলি গ্রহণ করা হবে, এটা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। একজন বলেছেন যে একটা কমিটি করে ব্যবস্থা করুন। এই প্রস্তাবটি খুব সঙ্গত প্রস্তাব। আপনারা কমিটি করতে পারেন। অন্তত কীভাবে কোন রাস্তা গ্রহণ করবেন এটা বিবেচনা করার জন্য প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েনসির একজন মেম্বার, এম এল এ থাকবেন এবং তাঁরা বিচার করে এটা ঠিক করবেন। তাঁরা সব রাস্তা গ্রহণ করতে পারবেন না। কাজেই যাঁদের রাস্তা গৃহীত হবে না, তাঁদের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দেবে এবং তাঁরা ভাববেন আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল না। কাজেই কমিটি একটা গঠন করা যেতে পারে এবং সেই কমিটি মারফত এই রাস্তাগুলি ভাগ করা যেতে পারে।

তারপর আমাদের অজিত কুমার বিশ্বাস মহাশয় বলেছেন শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান সম্বন্ধে। আমি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি একটা বাস্তু অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেটা আমাদের নিশ্চয়ই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের যাঁরা বড় বড় মনীষী, দেশনেতা, বিজ্ঞানী, কবি, স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁদের মর্মর মূর্তি স্থাপন করা আমাদের বিভাগের কাজ। সেদিক থেকে শরৎবাবুর গৃহটি আমরা যাতে রক্ষা করতে পারি, সেখানে যে রাস্তাঘাট আছে সেগুলি নির্মাণ করতে পারি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব। যাঁরা বলেছেন পল্লী অঞ্চলের মধ্যে রাস্তার কথা, তাঁদের বলি, সেগুলি বা সেই ভিলেজ রোডগুলি পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের রাস্তা। তারা সেই রাস্তাগুলি করবে এবং যেগুলি পারবে না সেগুলি আমাদের দেবে। অনেক জেলা পরিষদ আমাদের কাছে অনেক রাস্তা রেকমেন্ড করে পাঠিয়েছে। তার সংখ্যা বড় কম নয়। কাজেই সেদিক থেকে রাস্তাগুলি নিশ্চয়ই বিবেচনা করতে হবে। কমিটি যেগুলি বিবেচনা করবে

সেগুলি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে। আমাদের অনেকগুলি পুল হচ্ছে, মানসাহী সেতু সম্বন্ধে বিবেচনা হচ্ছে, কিছু কিছু কাজ আমরা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাড়াতাড়ি সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের যা টাকা ধরা হয়েছে তা থেকে যদি সঙ্কুলান হয় তাহলে নিশ্চয়ই অন্য সেতুগুলি আমরা গ্রহণ করব। আরও অনেক সেতুর কথা অনেকে বলেছেন। সেই সেতুর সংখ্যাও কম নয়। আমার ইচ্ছা ছিল সবগুলি করা। কিন্তু যদি অর্থের সঙ্গতি না থাকে সেইগুলি করা কী করে সম্ভব হবে? কাজেই সেদিক দিয়ে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আপনারা সাহায্য করবেন। আপনারা কোন সেতুটা কখন দরকার, কতখানি কী করতে হবে এই বিষয়ে প্রস্তাব দিন। তাহলে যেগুলি খুব প্রয়োজনীয় সেইগুলি নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। সদরঘাট সম্বন্ধে এখানে কথা উঠেছে। সেখানে বিরাট টাকার প্রয়োজন আছে, কয়েক কোটি টাকার দরকার। সদরঘাট ব্রিজ করতে গেলে যে অর্থ দরকার সেটা আমাদের নেই। আমরা নিশ্চয়ই সদরঘাট সেতু তৈরি করতে চাই। যেগুলি স্যাংশন ছিল যেগুলি মঞ্জুর ছিল সেইগুলি আমাদের এই পরিকল্পনা যখন গ্রহণ করা হবে তখন নিশ্চয়ই স্যাংশন করা হবে। যার প্রথম মঞ্জুরী আছে সেই রাস্তাগুলি নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব, অগ্রাধিকার দেব। কাজেই যে যা বলেছেন মোটামুটি তার উত্তর দিলাম। আর বেশি কিছু বলতে চাই না এবং যে কাটমোশনগুলি এসেছে সেইগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

২৪ জুলাই, ১৯৬৭।
(নিজের পূর্ত দপ্তরের বাজেট বিতর্কের উত্তরে)